সুধাতীর্থ তারাপীঠ

আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা—৯

"যে আমারে দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়

ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি"

জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা

ব্রহ্মানন্দ অবধূত—শ্রীচরণেষু

তারাপীঠ-ভৈরব শ্রী শ্রী বামদেব
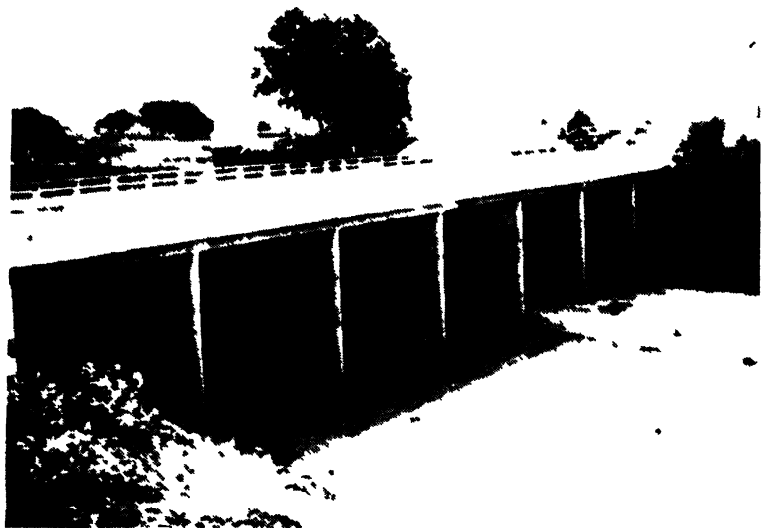
তারাপীঠেব প্রবেশ-পথ। নিচে বহমান দ্বাবক।

উত্তববাহিনী দ্বারকাব বাঁদিকে মহাশ্মশান

৺শ্রী মা তারার মন্দির

মন্দিরগাত্রের কারুকার্য

বিবামমঞ্চ। কোজাগরা শুক্লা চতুদশীর দিন ৺বা মাতাবা বিবামমঞ্চে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কবেন

চন্দ্রচূড় শিবের মন্দিরের সংস্কারকরণ চলছে—
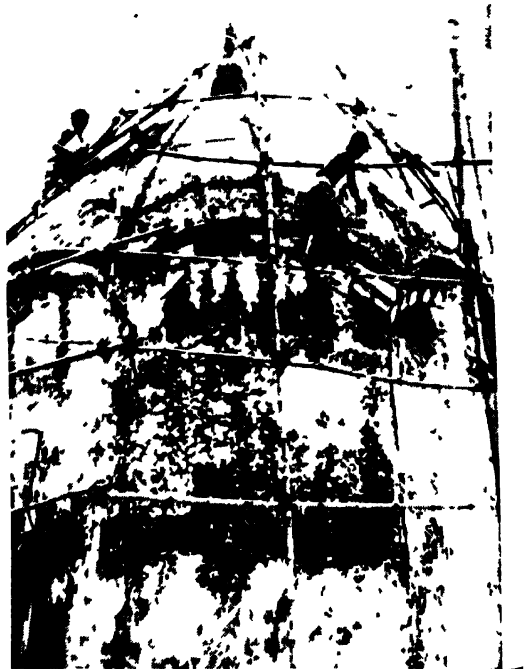
বামদেব ও নাবায়ণের মন্দির

বিষ্ণু মন্দিব

জীমিত কুণ্ডের উত্তর পাড থেকে দেখা যাচ্ছে মাযেব মন্দিব

তারাসাগর

তারা-ভৈরবের
সমাধি-মন্দির

সমাধি-মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য

পাদপদ্ম ও পঞ্চমুণ্ডির আসন

মহাশ্মশানে শিবাভোগ দেবার জায়গা

আমি মন বুঝি না, ধন বুঝি না, কি বুঝি তার নাইকো ঠিকানা। আমি এক অবোধ শিশু এ সংসারে, চাওয়া-পাওয়া নেইকো আমার জানা। আমি জানি না মোর মনের ঠিকানা। আমিও কি জানি? আমি কি জানি আমার মনের ঠিকানা? কি চাই আর কি চাই না?

সংসারের বেড়াজালে আবদ্ধ দেহ-মন, তুমি কোথায়? কোথায় হারালে তুমি নিজেকে? কোন্ সুধাতীর্থে?

তারাপীঠে? কি আছে সেখানে? কোন মায়াবিনীর মায়ায় ভুলেছো মন,—কেন? কিসের টানে, কোন আকর্ষণে হারাও নিজেকে?

ছোট্ট গ্রাম তারাপীঠ। ধু-ধু প্রান্তর, মজা নদী. শ্মশান, ছোট মন্দির। আর কি আছে—কিছু নেই। তবু বার বার মন তুমি কেন ছুটে যাও সেখানে! কোন্ বাঁধনে বাঁধা পড়েছো তুমি? কোন্ সে যাদু মন্ত্রে!

সুধাতীর্থে চলেছে মানুষ। আমি-তুমি অসংখ্য মানুষ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে, দুরন্ত বর্ষায়, ভয়ঙ্কর শীতে। মানব মিছিলের শেষ নেই। শুধু যাওয়া আর আসা। কেন এই বার বার যাওয়া। কেন?

চলেছে ধনী, দরিদ্র, অন্ধ-খঞ্জ, ভিখারী। চলেছে নাস্তিক-আস্তিক। কেন?

মন তুমি কি জান এ প্রশ্নের উত্তর—জান না। ভক্ত তুমি বলবে, মাকে দেখতে আসি। মা টানে তাই এই আসা। নাস্তিক তুমি কি বলবে? তুমিও জান না কেন আসো। আসলে নাস্তিকতা তোমার বহিরাবরণ, মন তোমার মাতৃময়।

যুক্তি-তর্কে বহু দূর। অঙ্কের চুল চেরা হিসাবে বাস্তবই সত্য। পুত্র শোকে কাঁদে কিন্তু মন। কেন কাঁদে? মৃত্যু তো বাস্তব সত্য।

যুক্তিবাদীরা বলেন, মায়া-মমতা-ভালবাসা মিথ্যা, সবই স্বার্থের ব্যাপার। কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে হবে। যায় কি? ভোগ যে কি যে জানল না, ত্যাগের মর্ম সে উপলব্ধি করবে কেমন করে!

সুধাতীর্থ! জগন্মাতা শক্তিরূপা মহাদেবী তারা সুধাতীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনিই আবার মহালক্ষ্মী, নীল সরস্বতী। উগ্র তারা রূপেই পূজিত হন। কিন্তু ভক্ত জনে মাকে শান্ত রূপেই কামনা করেন। সুধাতীর্থের দেবী তারা। যিনি দুঃখ, দারিদ্র, শোক, তাপ, কামনা-বাসনা পূরণ করেন, যিনি শক্তি দেন, শান্তি দেন, মঙ্গলময়ী জননী যে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের মা। তিনি সন্তানকে পৌঁছে দেন আপন লক্ষ্যে! তা-রূপী জীবনের দুর্লঙ্ঘ নদীটাকে রা রূপিনী তিনি পার করে দেন। সব সন্তানই তাঁর কাছে সমান। কোন ভেদ নেই। তিনি সকলের মা। জগজ্জননী!

সৃষ্টিকে রক্ষা করতে দেবাদিদেব হলাহল পান করে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। বিষের জ্বালায় অস্থির স্বামীকে অমৃত ভাণ্ডের সুধা পান করিয়ে জুড়িয়ে ছিলেন জ্বালা। প্রকৃতির বুকে আশ্রয় নিয়েছিল পুরুষ। রক্ষা করেছিলেন আপন সৃষ্টিকে। তিনি যে ব্রহ্মময়ী। সৃষ্টি তত্ত্বে তিনি কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি।

তিনি জগজ্জননী। ভক্তের কাছে তিনি শুধু মা। কেউ ছুটে আসে শুধু দেখতে। কেউ বা দুঃখ ভুলতে। কেউ মনের বেদনা জানাতে। আবার কেউ বা শান্তি খোঁজে তাঁর ভুবন ভোলানো রূপের দিকে চেয়ে-চেয়ে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভক্তের দল, সন্তান, মাকে দেখে ভিন্নরূপে। সকলের দেখা সমান নয়। চাওয়া প্পাওয়াও। মা কারো কাছে ভয়ঙ্করী, কেউ বা দেখে মাতৃময়। আবার কারো চোখে শুধুই সাজানো পুতুল। এ শুধু দেখার তফাৎ, অনুভূতি! নাস্তিকও লুটিয়ে পড়ল

মা-মা বলে। কেন তিনি লুটিয়ে পড়েন তিনি কি জানেন, জানে কি তাঁর মন? মায়াবিনী কখন কাকে ভোলায় কেমন করে কে পারে বলতে!

অধম আমি সাবধান করি পরিচিত জনে। সুধাতীর্থের নাম উঠলেই রে-রে করে উঠি। বলি সাবধান, হুঁশিয়ার হও ভাই। যাবে যাও ইচ্ছে হলে তোমার। মতামতে দায় নেই আমার। তারা নয়গো পারা। কুহকিনী মায়ায় যদি ভোল, নাচার আমি।

তবু চলেছে মানুষ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। যাত্রা শুরু সুদূর অতীতে। সে চলার বিরাম আজও ঘটে নি। ঘটবেও না কোন দিন। মা দুহাত বাড়িয়ে লোলজিহ্বায় ডাকছেন। সে ডাক কি উপেক্ষা করা যায়।

যায় না বলেই চলেছে সন্তানের দল। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে, প্রতিমুহূর্তে সুধাতীর্থের আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মা-মা ডাকে।

একদিন, সুদূর অতীতে তারাপীঠের আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মা-মা ডাকে।

একদিন, সুদূর অতীতে তারাপীঠের আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত তারা-তারা রবে বজ্র গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠে। তারাপীঠ ভৈরব ডাকতেন মাকে। হাতে লাঠি। শালপ্রাংশু দিগম্বর মুক্ত পুরুষ। কষ্টি পাথরের মত গাত্রবর্ণ। গভীর রক্তবর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন দুই চোখ। ভয়ঙ্কর শ্মশানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান দিন রাত্রি। ডাক তো নয় যেন হুঙ্কার, তারা-তারা!

তারা নাম আজও সুধাতীর্থের আকাশে বাতাসে ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হয়। ঝিল্লিরবে মুখরিত রাতের বাতাসে শোনা যায়, ওঙ্কার ধ্বনি। গভীর নিশীথে শ্মশানে বিচরণ করেন তিনি, তারাপীঠ ভৈরব।

তারাপীঠ ভৈরব। বামদেব। কেউ বলে বামাক্ষেপা। কেউ বা পাগল!

মানুষ আদর করে বলতো ক্ষেপা। ক্ষেপা বাবা। সত্যই তিনি ক্ষেপা, ক্ষেপা যদি না হতেন কেমন করে পেতেন মাকে! সংসারের সহস্র প্রলোভন দূরে সরিয়ে শ্মশানকে করেছিলেন ঘর। উপেক্ষা করেছিলেন জঙ্গলের বাঘ ভল্লুক সাপের ভয়কে।

কার জন্যে? শুধু কি নিজের জন্যে? দীন দুঃখী দরিদ্র আর্ত-পীড়িত মানুষের জন্যে কেঁদে উঠতো তাঁর অন্তর। পাপী তাপী সকলেই তাঁর কাছে ছিল সমান। সন্তানের দুঃখ-বেদনায় আকুল হয়ে উঠতো তাঁর মন। মন ছিল তাঁর মাতৃময়।

সুধাতীর্থ তারাপীঠ। অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা তারা। কিন্তু বামদেব? তারাপীঠ ভৈরব।

শুধু মাকে ডাকলেই হবে না। ডাকতে হবে তাঁকেও। তিনিই তো জগতে জানিয়েছেন মাতৃ মহিমা। চিনিয়েছেন মাকে।

চলেছে মানুষ। যাত্রা মাতৃদর্শনে। পাগল মন বার বার টেনে নিয়ে যায়। কাজ থেকে অ-কাজে। হিসাবের বাইরে। মাকে ডাকে, মাকে দেখে। দুঃখ ভোলে, শোক-তাপ। মন ভরে যায় আনন্দে।

ফিরে আসে ঘরে। আবার ডাকে। মন ছুটে যায়। সুধাতীর্থের ডাক আসে অন্তরে। চল চল মন, বেরিয়ে পড়ি, ঘুরে আসি আপন ঘরে। ডাক এসেছে, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে ওই শোন দেহমন্দিরে।

চল মন বেড়িয়ে পড়ি সুধাতীর্থের পথে।

আত্মভোলা সদানন্দময় অজাত শত্রু সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ধার্মিক, সরল, সাহসী পুরুষ। পত্নী রাজকুমারী। আপন ভোলা স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। পতিব্রতা স্নেহময়ী জননী।

সামান্য কিছু ক্ষেত-খামার। ভাগ চাষী যা দেয় তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। হিসাবের ধার তিনি ধারতেন না। সরল বিশ্বাসে আপন

প্রাপ্য মেনে নিতেন তিনি। আর ছিল পূজা পাঠ। সংসারে নিত্য দিনের অভাব অনটন কিন্তু মুখের হাসিটি ছিল অম্লান।

স্ত্রী অনুযোগ করতেন, তুমি কি বলতো?

সকলে বলছে তুমি ঠকছো। ভাগ চাষী ফসল তোমাকে কম দিয়েছে।

কম দিয়েছে। স্ত্রীর কথা শুনে অবাক হতেন সর্বানন্দ। বলতেন, কম কোথায় গো। ওইতো অনেক দিয়েছে।

হিসাব নিয়েছো ফসলের? জিজ্ঞাসা করতেন স্ত্রী।

হিসাব! হাসতেন সর্বানন্দ। বলতেন, কিসের হিসাব নেব বল। এবার খরার বছর। মা যা দিয়েছে যথেষ্ট।

এই ফসলে সারা বছর চলবে?

স্ত্রীর প্রশ্নে গম্ভীর হতেন সর্বানন্দ। ভাবতেন। হাসতেন। বলতেন, চলবে কি না তিনিই জানেন।

আমি?

না গো না তুমি নও। যিনি জীব দিয়েছেন আহার তিনিই দেবেন। সবই তারা মায়ের ইচ্ছে। বিশ্বাস রাখো তাঁর ওপর। অনাহারে তিনি সন্তানকে নিশ্চয়ই রাখবেন না।

সে বিশ্বাস রাজকুমারীর মনেও ছিল। আপন ভোলা স্বামীকে নিয়ে খুশী হয়েছিলেন তিনি। বলতেন, সে বিশ্বাস আমার আছে।

প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠতেন সর্বানন্দ। বলতেন, এই তো চাই। কে একটু কম দিল, কে ঠকালো তা ভেবে মনকে ছোট করি কেন? যে কম দিয়ে ভাবলো ঠকিয়েছি খুব, আসলে ঠকলো সে নিজেই। দিন রাত্রি এই চিন্তাই তার মন জুড়ে থাকবে—মায়ের নাম করবে কখনো। তুমি আমি ওসব কথা না ভেবে বরং সেই সময়টায় তাঁকে ডাকি। মা আমার অন্নপূর্ণা, দিনের আহার ঠিকই জুটিয়ে দেবেন।

এই মানুষ সর্বানন্দ। বেহালা বাজান। মায়ের নাম করেন। শত দুঃখ-কষ্টেও মুখের হাসিটি অম্লান।

উত্তর বাহিনী নদী দ্বারকা। দ্বারকা নদীর ধারেই তারাপীঠ মহাশ্মশান। তারা মায়ের মন্দির। নদীর ওপারে কিছু দূরেই আটলা গ্রাম। কাজের অবসরে আটলা থেকে মায়ের মন্দিরে ছুটে আসেন সর্বানন্দ। সযত্নে কাঁধে তুলে নেন বেহালা। সুরের মায়ায় ভরে যায় মন্দির প্রাঙ্গণ। দুচোখ বুজে মাতৃনামে বিভোর হয়ে যান গায়ক। একের পর এক গেয়ে চলেন তিনি। কে শুনলো বা শুনলো না তাতে তাঁর দিক্‌পাত নেই, মায়ের নামগানে মাতাল মন গেয়ে চলেন আপন খুশির খেয়ালে। সংবিত ফিরতে দেখেছেন দিনের সূর্য অস্তাচলের পথে।

এমন বহু দিন হয়েছে, হাটে চলেছেন সর্বানন্দ। সঙ্গে সর্বক্ষণের সঙ্গী বেহালাটি। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, আ ম এলাম।

রাজকুমারী বলেছেন, সকাল সকাল ফিরো কিন্তু। যা বলে দিয়েছি ভুলো না যেন।

হেসেছেন সর্বানন্দ। বলেছেন, এই যাব আর আসবো। সবই আমার মনে আছে। কিছু চিন্তা কোর না।

স্বামীর সঙ্গী বেহালাটিতে দৃষ্টি পড়েছে স্ত্রীর। বলেছেন, তুমি তো হাটে যাচ্ছ ?

নিশ্চয়ই। হাটেই তো যাচ্ছি বটে। হেসেছেন সর্বানন্দ। তুমি তুমি যা বলে দিয়েছো তার কিছুই ভুলিনি।

কিন্তু ওটাকে নিয়ে কোথায় চলেছো ?

বেহালাটা ? হেসেছেন তিনি। গভীর মমতায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়েছেন সর্বক্ষণের সঙ্গীটির গায়ে। বলেছেন, থাক সঙ্গে। জয়-কালিটা বড় দুষ্টু হয়েছে। এটার ওপর ওর বড় টান।

জয়কালী তাঁদের প্রথম কন্যা সন্তান। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তিনি। সর্বানন্দ অল্প বয়সেই যোগ্য পাত্রে তাঁকে সম্প্রদান করেছিলেন কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র কবছর পরেই বিধবা হয়ে পিতৃ গৃহে ফিরে এসেছিলেন।

স্বামীর কথা শুনে মনে মনে না হেসে পারেননি রাজকুমারী। বেহালাটির ওপর কার টান কত তা তাঁর অজানা নয়। বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।

নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। তারা মায়ের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সর্বানন্দ। অর্ধদণ্ডের পথ হাটতলা। চলেছেন তিনি নিজের মনে। কণ্ঠে মাতৃ নাম। কখনো বা স্মরণ করছেন স্ত্রীর সংসারের জিনিসের কথা।

প্রাতঃপ্রণাম ঠাকুর।

দাঁড়িয়ে পড়েন সর্বানন্দ। তাকান পথচারীদের মুখের দিকে। চেনা-চেনা লাগে।

ভাল আছেন তো ঠাকুর ?

ভাল। হাসেন সর্বানন্দ। তারামায়ের কৃপায় সবই কুশল। তা তোমাদের ঠিক......

আমাদের ঘোষ পাড়ায় বাড়ি।

তাই বল। লজ্জিত হাসি ফুটে ওঠে সর্বানন্দের মুখে। বলেন, এবার চিনতে পেরেছি। আরে তুমি তো অক্ষয় মণ্ডল। তা দল বেঁধে কোথায় চলেছো তোমরা ?

তারা মায়ের মন্দিরে যাব পুজো দিতে।

পুজো দিতে যাবে। বেশ-বেশ, যাও ঘুরে এসো।

তা ঠাকুর আপনি কোথায় চলেছেন ?

হাটে যাব। কেনাকাটা করতে হবে।

তা ঠাকুর হাটে যাবেন তা সঙ্গে ব্যায়লা কেন ?

তাইতো! হাসেন সর্বানন্দ। হাটে চলেছেন সঙ্গে বেহালা নিয়ে। রাজকুমারীকে বলেছিলেন বেহালার ওপর বড় টান জয়-কালীর। দুধের শিশু! ওপর কোথাও তুলে রেখে এলেই তো পারতেন। জয়কালীর কচি হাত নিশ্চয়ই নাগাল পেত না সেখানে।

ছোট্ট দলটি বলে, চলি ঠাকুর, প্রণাম।

সর্বানন্দ বলেন, চল, আমিও একবার তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আসি। কদিন ধরে যাই-যাই করছে মনটা, কিন্তু সময়ের অভাবে যাওয়া হয়ে উঠছে না। আজ যখন মা তোমাদের সঙ্গী হিসাবে জুটিয়ে দিয়েছেন, একবার দেখেই আসি মাকে।

ঠাকুর হাটে যাবেন না?

যাব বৈকি। হাসেন সর্বানন্দ। সামান্য তো পথ, কতক্ষণ বা লাগবে যেতে আসতে। একবার শুধু মাকে দেখেই সোজা হাটে চলে যাব। এগিয়ে চলে ছোট্ট দলটি। সঙ্গী সর্বানন্দ।

নদী পার হয়ে তারামার মন্দিরে প্রবেশ করেন সকলে। মায়ের ভুবন ভোলানো রূপের দিকে স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সর্বানন্দ। দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়ে আনন্দাশ্রু। মাকে প্রণাম করে মন্দিরের একপ্রান্তে বসেন। তুলে নেন বেহালা। কণ্ঠে আকুল মাতৃনাম।

কতক্ষণ তিনি গান গেযেছেন জানেন না। হঠাৎ স্তব্ধ হয় কণ্ঠ। সংবিত ফিরে পান। দেখেন পূবের সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ছে।

অনেকক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকেন তিনি। শূন্য মন্দির প্রাঙ্গণ। যে যার ফিরে গেছে আপন গৃহে। তাঁরও মনে পড়ে গৃহের কথা। স্ত্রী-কন্যার কথা। সকালে তিনি হাটে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন। পথে জুটে গিয়েছিল সঙ্গীদল। চলে এসেছিলেন তারা মায়ের মন্দিরে।

মনে মনে হাসেন তিনি। আবার দুঃখও পান। হাসেন এই ভেবে মায়ের একি খেলা। দুঃখ পান স্ত্রীর কথা ভেবে। সূর্য অস্তাচলের পথে, তাঁর পথ চেয়ে অভুক্তা স্ত্রী নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সদা হাস্যময়ী, পরম বুদ্ধিমতী রাজকুমারী যে তাঁর সুখে সুখী—তাঁর দুঃখে দুঃখী।

উঠে পড়েন সর্বানন্দ। মার সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। মনে মনে বলেন, মাগো, পথ ভুলিয়ে কর্তব্যচ্যুত করে কেন যে এখানে টেনে নিয়ে এসেছো তুমিই জান মা।

বৃদ্ধ পূজারী ডাকেন, বাবা!

সর্বানন্দ উঠে দাঁড়ান।

একটা পুঁটলি সর্বানন্দের হাতে তুলে দিয়ে পূজারী বলেন, মন্দির এবার বন্ধ হবে, বাড়ি যান বাবা।

এতে কি আছে বাবা?

মার প্রসাদ।

তারামার প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে বেহালা হাতে নদী পার হয়ে গ্রামের পথ ধরেন সর্বানন্দ। অগ্রহায়ণের গোধূলির রক্ত রাগ। দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেত্রে সোনালী সমারোহ। উত্তুরে বাতাস বইছে হা-হা করে।

দ্রুত পথ চলেন সর্বানন্দ। শুনতে পান শঙ্খধ্বনি। ছায়া ছায়া অন্ধকারে বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখতে পান দরোজার কাছে পাষাণ প্রতিমার মত স্থির নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে অবগুণ্ঠিতা স্ত্রী। দুঃখে বেদনায় ভরে যায় মন। এ তিনি কি করেছেন! ছিঃ ছিঃ।

অপলক দৃষ্টিতে আবছায়া অন্ধকারে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন রাজকুমারী। কণ্ঠ বাক্যহারা।

সর্বানন্দ লজ্জিত কণ্ঠে বলেন, আমার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।

রাজকুমারী বলেন, এসো।

আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন সর্বানন্দ। প্রদীপ জ্বালেন রাজকুমারী। এগিয়ে দেন হাত পা ধোবার জল-গামছা।

সর্বানন্দ স্ত্রীর ব্যবহারে কিছুটা বিস্মিত। বলেন, এটা রাখো।

কি?

তারামার প্রসাদ।

নীরবে দুহাত পেতে মার প্রসাদ গ্রহণ করেন রাজকুমারী। পরম ভক্তি ভরে মাথায় ঠেকান। সর্বানন্দ বেহালাটি রেখে হাত পা ধুয়ে নেন। স্ত্রী আসন পেতে স্বামীকে খেতে দেন মার প্রসাদ। খেতে বসেন তিনি। বলেন, রাজকুমারী খুবই অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

রাজকুমারী তাঁর আয়ত দুই চোখ তুলে একবার শুধু স্বামীর মুখের দিকে তাকান। কোন কথা বলেন না। আত্মভোলা সরল স্বামীকে তিনি চেনেন। স্বামী-গর্বে তিনি গরবিনী থাকুক না কেন সংসারে দারিদ্র অনটন। জন্মান্তরের অনেক সাধনার ফলে এমন স্বামী তিনি পেয়েছেন।

সর্বানন্দ নিজের মনেই বলেন, কি করবো বল। হাটেই তো যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পথে সঙ্গী জুটে গেল। ভাবলাম অনেক দিন তারামার কাছে যাওয়া হয়নি। একবার গিয়ে শুধু দর্শন করেই হাটে চলে যাব। হেসে ওঠেন তিনি নিজের মনেই। বলেন, ঠিক করলাম তো দেখেই হাটে চ'লে যাব আবার কিন্তু কি যে হয়ে গেল সব ভুলে গান গাইতে বসে গেলাম। যখন চমক ভাঙ্গল দেখি সূর্য পাটে বসছে। পূজারী মায়ের ভোগ হাতে তুলে দিলে। আচ্ছা, আজ রান্না করোনি তুমি?

না।

তাহলেই বুঝে দেখ মায়ের কি করুণা। কিন্তু···সর্বানন্দ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। বলেন, হাট থেকে ফিরলে তবে রান্না হবে একথা তো তুমি কয় বলনি আমাকে?

হাসেন রাজকুমারী। বলেন, বলে দিলে তুমি হাটে চলে যেতে?

তা-তা···। দ্বিধাগ্রস্ত হন সর্বানন্দ। হেসে ফেলেন। শিশুর সরলতায় সর্বানন্দ বলেন, মায়ের ইচ্ছে না হলে কেমন করে যাই বলতো?

মা আজ আমাদের রক্ষা করেছেন। মৃদু কণ্ঠে বলেন রাজকুমারী।

সর্বানন্দ অবাক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান।

রাজকুমারী বলেন, তারামা যদি আজ তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে না যেতেন ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। নবাবের সৈন্যরা আজ হাটে চড়াও হয়েছিল। হাটের বহু মানুষ আজ তাদের হাতে নিহত হয়েছে। অনেকে পালাতে গিয়েও পালাতে পারেনি।

স্ত্রীর মুখে যবনের অত্যাচারের কথা শুনতে শুনতে কঠিন আকার

ধারণ করেছিল আত্মভোলা সর্বানন্দর মুখমণ্ডল। তারা মায়ের কৃপায় তিনি রক্ষা পেয়েছেন ঠিক কথা কিন্তু যারা রক্ষা পায়নি?

শুধু যবন নয়, যবন আর ম্লেচ্ছের অত্যাচারে গ্রাম গঞ্জের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর্তের হাহাকারে আকাশ বাতাস মুখরিত। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের একই অবস্থা। মানুষ কাঁদছে। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছে। প্রতিকারের পথ রুদ্ধ।

প্রতিবাদ? প্রতিবাদ করলেই মৃত্যু। গ্রামে গঞ্জে নিত্য তাই সংঘর্ষ। নবাবী সৈন্যের অত্যাচারে মানুষ দিশাহারা। কলঙ্কিত হচ্ছে ধর্ম। নারীত্ব নিয়ে চলেছে ছিনিমিনি খেলা।

সদানন্দময় পুরুষ সর্বানন্দের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে ওঠে। করুণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। ক্রুদ্ধ আক্রোশে নিজের মনেই মাথা খোঁড়েন তিনি। মনে পড়ে তারামায়ের মুখখানি। প্রশান্ত—উজ্জ্বল। মা সত্যই পাষাণী। পথ ভুলিয়ে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে রক্ষা করলে, কিন্তু যে অসংখ্য প্রাণ তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যবনের হাতে বলি হল, তারা কি মায়ের সন্তান নয়?

স্বামীর ম্লান গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে রাজকুমারী মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, কি ভাবছো বলতো?

ভাবছি তারা মায়ের কথা। মা আমাকে কত ভালবাসে বলতো?

স্বামীর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে চুপ করে থাকেন রাজকুমারী।

হাসেন সর্বানন্দ। ম্লান করুণ সে হাসি। বলেন, একজন সর্বানন্দকে পথ ভুলিয়ে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করলেন তারামা। ওধারে কত সর্বানন্দ যবনের হাতে মরলো সেদিকে একবারও চেয়ে দেখলেন না।

ও কথা বলছো কেন? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন স্ত্রী।

স্বামী বলেন, বলছি অনেক দুঃখে-বেদনায়। ভাবছি মানুষের ওপর মানুষের এই অত্যাচার পীড়ন কবে শেষ হবে। কবে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-

নীচ সমস্ত মানুষ মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে মা-মা রবে আকাশ বাতাস মুখর করে তুলবে ? তারামা কবে সকলের মা হয়ে উঠবেন ?

তারা মা তো সকলের মা। মৃদু কণ্ঠে বলেন স্ত্রী।

সর্বানন্দ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। চেয়ে থাকেন। দেখেন। মৃদু হাসির সূক্ষ্ম একটা রেখা তাঁর ওষ্ঠে ফুটে ওঠে। বলেন, সত্যই তারামা সকলের মা। কিন্তু মায়ের মত মা কি তিনি ?

স্বামীর কথায় রাজকুমারীর বুকের মধ্যেটা অজানা আশঙ্কায় থর থর করে কেঁপে ওঠে। করজোড়ে তিনি মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। মনে মনে মায়ের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেন। আত্মভোলা সদানন্দময় মানুষটিকে তিনি বেশ ভাল করেই চেনেন। এ মানুষ যেমন কোমল, তেমনি কঠিন। নিষ্ঠাবান্ পরম ধার্মিক কিন্তু সংস্কার মুক্ত। কুসংস্কারকে ঘৃণা করেন, সঙ্কল্পে অটল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এতটুকু ভীত নন।

স্ত্রীর দিকে তাকান সর্বানন্দ। দেখেন স্ত্রীকে। উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানি তাঁর ভরে। শুধু স্ত্রী নয় এ যে মা। তারামায়ের প্রতি-মূর্তি যেন রাজকুমারী।

তারা মায়ের কাছে মঙ্গল কামনা করে স্বামীর মুখের দিকে তাকান রাজকুমারী। দেখেন শিশুর সারল্য ভরা হাসি স্বামীর মুখে। মাতৃস্নেহে ভরে যায় তাঁর মন। মাতৃ জঠরে যে অনাগত শিশু আলোর দিন গুণছে। দিন-রাত্রির প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্তে জানাচ্ছে আগমন সংবাদ তার জন্যেও তিনি তারামায়ের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা জানান।

সেদিন সকাল থেকেই রাজকুমারী কিছুটা কাতর। তবুও সেই ভোর থেকে সংসারের কাজ করে চলেছেন তিনি। রান্না করেছেন। জয়কালীকে স্নান করিয়ে খাইয়েছেন। সর্বানন্দের উপবাস। ত্রয়োদশী-যুক্তা শিবচতুর্দশী। অন্য বছর তিনিও উপবাস করেন। এবারও

করবেন মনস্থ করেছিলেন কিন্তু স্বামীর নিষেধে বিরত হয়েছেন। তিনি আসন্ন প্রসবা।

স্ত্রীর মুখের ভাব দেখে সর্বানন্দ জানতে চেয়েছিলন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট, হেসে ফেলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন রাজকুমারী। প্রসব বেদনার কথা নারী হয়ে পুরুষকে বলেন কি করে! বলেছিলেন, না তো, কষ্ট কোথায়?

কিন্তু তোমার মুখ চোখের ভাব আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।

রাজকুমারী বলেছিলেন, আমি ঠিক আছি, তোমার দেখার ভুল।

হবে হয়তো। স্ত্রীর কথাই মেনে নিয়েছিলেন সর্বানন্দ। একলার সংসার। সব কাজই করতে হয় রাজকুমারীকে। যদিও প্রতিবেশীরা সময়ে অসময়ে সাহায্য করে।

সর্বানন্দ সমস্ত দিনটা একা-একা কাটিয়েছেন। তারাপীঠে তারামার মন্দিরে আজ উৎসব। বহু দূর-দূর গ্রাম গঞ্জ থেকে মানুষ আসবে। কদিন আগে থেকেই এসেছে কত মানুষ। ধনী দরিদ্র, ব্যবসায়ী জমিদার কত মানুষ। প্রতিবেশী কতজন চলে গেছে।

কেউ বা জিজ্ঞাসা করেছেন, কি সর্বানন্দ যাবে না তুমি?

কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছেন তিনি, কোথায়?

সে কি হে কোথায় কি? অবাক হয়েছেন প্রতিবেশী, তুমি কি ভুলে গেছ?

না-না, ভুলবো কেন। লজ্জিত হয়েছেন তিনি।

প্রতিবেশী বলেছেন, তোমার শরীর কি ভাল নেই?

না, আমি ভালই আছি।

সেই জন্যেই বলছিলাম। আজকের দিনে তারামায়ের মন্দিরে সারা রাত্রি তুমি গান করো। সেই তুমি আজ মনমরা হয়ে ঘরে বসে আছো।

একটু বিশেষ কাজ আছে কাকা।

তাই বল। তাহলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তুমি তোমার কাজ শেষ করে এসো তাহলে। তোমার গান না শুনলে তৃপ্তি হয় না সর্বানন্দ। মায়ের মন্দিরে উৎসব আর তুমি থাকবে না, তা কি হয় ?

হাসেন সর্বানন্দ। কোন উত্তর দেন না।

প্রতিবেশীর দল আটলা থেকে তারাপীঠের পথে যাত্রা করেন।

বসে থাকেন সর্বানন্দ। উদাসী মন। এবার বুঝি মা তাঁকে নিয়ে যাবেন না। স্ত্রীকে একলা রেখে তিনিই বা যান কেমন করে, যাওয়াটা উচিতও হবেনা।

মধ্য গগনের সূর্য ক্রমশ পশ্চিমের পথে যাত্রা করে। ফাল্গুনের নির্মেঘ আকাশ। বসন্তের দূত কোকিল ডাকছে কাছে দূরে। রিক্ত ধু-ধু প্রান্তর। গ্রামের প্রান্তে শীত শেষের দ্বারকা তির তির করে বয়ে চলেছে।

গৃহ আঙিনায় গাছতলায় দূর পথের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলেন সর্বানন্দ। মন তার তারাপীঠে তারামায়ের মন্দিরে। তিনি যেন মাকে দেখছেন দুচোখ ভরে। চিন্ময়ী মা আজ হাস্য মুখী বরদায়িনী। ভক্তের মনবাঞ্ছা পূরণ করতে দূর দূরান্তে ডাক দিয়েছেন শত শত সন্তানকে। তিনি যেন মধুর কণ্ঠে ডাকছেন, ওরে আয় আয় আয়। যেখানে আছিস ছুটে আয় আমার কাছে !

হঠাৎ করস্পর্শে চমকে উঠেছিলেন সর্বানন্দ। দেখেছিলেন রাজকুমারীকে।

কি ভাবছো ? মৃদু কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন রাজকুমারী।

লজ্জিত হয়েছিলেন সর্বানন্দ। চুপ করে রইলেন।

তুমি আজ তারামায়ের মন্দিরে যাবে না ? জানতে চেয়েছিলেন রাজকুমারী।

না। দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেছিলেন সর্বানন্দ।

কেন ?

তিনি চুপ করেছিলেন কোন উত্তর না দিয়ে।

কি হল চুপ করে রইলে যে? আবার প্রশ্ন করেছিলেন রাজ-কুমারী।

কি বলবো? উদাস শুনিয়েছিল সর্বানন্দের কণ্ঠস্বর।

মায়ের মন্দিরে যাবে না কেন?

যাওয়া কি উচিত হবে আমার?

কিন্তু কত মানুষ তোমার গান শুনবে বলে তোমার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে বলতো? প্রতি বছর এই দিনে তারামায়ের কাছে আসে। তোমার মুখে মায়ের নামগান শুনে বিভোর হয়। তুমি তাদের এবার বঞ্চিত করবে?

কিন্তু তোমার এই অবস্থায়···

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠেন রাজকুমারী। বলেন, আচ্ছা পাগল তো তুমি যাহোক। আমার আবার কি অবস্থা। যদি কিছু হয় বামুন-দিদি রয়েছে, চাঁড়াল বউ আছে। তুমি শুধু শুধু মন খারাপ করে বসে থেকে কি করবে বল?

স্ত্রীর কথায় লাফিয়ে ওঠেন সর্বানন্দ। সত্যই তো তিনি শুধু শুধু বসে থেকে কিই বা করবেন! বলেন, আমি যাব?

নিশ্চয়ই যাবে। হাসেন রাজকুমারী। আঁচলের আড়াল থেকে বার করে দেন স্বামীর প্রিয় সঙ্গী বেহালাটি। বলেন, কাল সকালেই ফিরে এসো কিন্তু, দেরি কোর না যেন।

আনন্দের অতিশয্যে উঠে দাঁড়ান সর্বানন্দ। মুগ্ধ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকান। হাসেন। বলেন, আসি!

এসো।

তারাপীঠের পথে খুশির আনন্দে এগিয়ে চলেন সর্বানন্দ। বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন বেহালাটি। আকাশে দিন শেষের ম্লান ছায়া। দ্বারকা বয়ে চলেছে আপন খুশির ছন্দে। মায়ের মন্দির থেকে ভেসে আসছে শত কণ্ঠের জয়ধ্বনি। বেজে চলেছে কাঁসর ঘণ্টা। ঢাকের বাদ্য মাতাল করে তুলছে মনকে।

সর্বানন্দ দ্রুত হাঁটছেন। অস্তগামী সূর্যের আলোয় মন্দিরের চূড়া ঝক্ ঝক্ করছে। মন তাঁর পাখির ডানায় ভর করে পৌঁছে গেছে মন্দির প্রাঙ্গণে। নাটোরের রাণীমা এসেছেন। গলবস্ত্র হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি মন্দির দ্বারের কাছে।

দ্বারকা পার হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন সর্বানন্দ। মা, মাগো, একি তোমার ছলনা। সেই নিয়ে এলে তবে সকাল থেকে কষ্ট দিলে কেন বলতো? কি এমন অপরাধ করেছি তোমার চরণে!

আকুল আর্তি ফুটে ওঠে সর্বানন্দের মনে। কণ্ঠে ঝরে গান। ভক্তজনের সব গুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়।

রাত্রি শেষের শুকতারাটি ফুটে ওঠে আকাশে। হঠাৎ গান থামিয়ে উঠে দাঁড়ান সর্বানন্দ। আর নয় এবার ফিরতে হবে। কিন্তু ফিরবেন কেমন করে তিনি। রাতের অন্ধকার এখনও গাঢ় হয়ে আছে। উষার আলো ফুটতে এখনও অনেক বাকী। কেমন করে পথ চিনবেন?

তা হোক। যিনি নিয়ে এসেছেন, তিনি ঠিক পথ চিনিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। মাকে প্রণাম করে বেহালা হাতে পথে নামেন সর্বানন্দ। নদী পার হন। অন্ধকার ধু-ধু প্রান্তর। ঝোপে ঝাড়ে জ্বলছে জোনাকি। ঝিল্লি রবে মুখর বনপথ। শিবাধ্বনিতে শেষ প্রহরের আনন্দ প্রকাশ!

মুহূর্ত দাঁড়ান সর্বানন্দ। চিন্তার অবকাশ নেই। তারামা-ই যেন ফিরে যেতে বলছেন গৃহে। কাঁধে তুলে নেন বেহালা। সৃষ্টি হয় সুরের মায়াজাল। কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মাতৃনাম। একাকী সর্বানন্দ এগিয়ে চলেন আটলার পথে।

ঢেঁকিশালে রাজকুমারী প্রদীপের আলোয় বার বার নব জাতকের দি:কে তাকান। একি তাঁর সন্তান! আয়ত চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসা, কষ্টি পাথরের মত গায়ের রঙ। হৃষ্ট পুষ্ট এ শিশুকে দেখলে কে বলবে সদ্যজাত। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে তাঁর মুখের দিকে। একবার

শুধু ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল জন্মমুহূর্তে। তারপর থেকে মুখে ফুটি-ফুটি হাসি। হাত পা নেড়ে খেলা করছে মনের আনন্দে।

রাজকুমারী চেয়ে আছেন তো, চেয়েই আছেন। দেখছেন তাঁর নাড়ী-ছেঁড়া ধনকে।

হঠাৎ-ই তাঁর কানে আসে পরিচিত স্বর। চমকে ওঠেন রাজকুমারী। আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে বুকটা। আপন ভোলা মানুষটাকে সকাল সকাল ফিরতে বলেছিলেন বলে, রাতের অন্ধকারেই ফিরে আসছেন। শিশুকে বুকের কাছে টেনে নেন তিনি। ভৈরব জননী।

সনটা তেরশো চুয়াল্লিশ সালের বারোই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। তারাপীঠের প্রাণপুরুষের জন্মসময় রাত্রি তিনটা বেজে একান্ন মিনিটে।

নাম ছিল কামকোটি। পরে হয়েছে বীরভূম। নামের ব্যাখ্যায় নানামত। বীরভূমের রত্নাগর নিবাসী জয়দত্ত বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার মতই একাহিনী। ফিরছেন তিনি আপন ঘরে। একের পর এক নৌকা বোঝাই দ্রব্যসম্ভার।

ভাদ্রের ভরা নদী দ্বারকা। ভয়ঙ্করী দ্বারকা। আকাশের সূর্য অস্তগামী। সামনে কিছুদূর গেলেই গভীর জঙ্গল। দিনের আলোয় অতি সাহসীর বুক কাঁপে, রাতের অন্ধকারে প্রেতপুরী। জয়দত্ত হুকুম করেন সর্দার মাঝিকে, তাড়াতাড়ি চল বাবা। যেটুকু আলো আছে তার মধ্যেই যেন পার হতে পারি সামনের জঙ্গলটা।

সর্দার মাঝি সেই কথাই জানিয়ে দেয় প্রতিটি নৌকাতে। উজানে বাইতে হলেও পার হতে হবে সামনের জঙ্গল।

কিন্তু বিধি বাম। এর নামই বোধহয় নিয়তি। দ্বাদশ নৌকার এগারোটা রয়েছে, পেছিয়ে পড়ছে একখানি।

সর্দার মাঝির আদেশে সন্ধানী নৌকা ছোটে পেছন দিকে। ফিরে

আসে সামান্য পরেই। সংবাদ দেয়, হঠাৎ কি করে যেন পাথরে ধাক্কা লেগে ফুটো হয়েছে নৌকা। মাল নষ্ট হয়নি সবই রক্ষা পেয়েছে মাঝিদের তৎপরতায়। নৌকার ফুটো সারাইয়ের তোড়জোড় চলছে।

সর্দার মাঝি জানতে চায় মনিবের দিকে চেয়ে, এখন কি করবো?

নৌকা বাঁধ। হুকুম দেন জয়দত্ত।

কিন্তু এই জঙ্গলের ধারে! ডাকাতের আড্ডা নিশ্চই আছে। তবু জয়দত্ত হুকুম দেন নৌকা বাঁধার। কপালে যা আছে তাই ঘটবে। ভগবান রক্ষা করলে করবেন।

সন্ধানী নৌকা যায় পিছনের নৌকাকে পাহারা দিতে। মাঝিরা নোঙর করে তীরে নামে। রাতের রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুরে দেখে আসতে হবে চারিধার। পানীয় জলও প্রায় শেষ। কোন পুকুর যদি আশেপাশে না পাওয়া যায় অগত্যা নদীর জলই খেতে হবে।

চারিদিক দেখার জন্যে এগোয় একদল মল্লা। একদল করে রান্নার আয়োজন। দিনের আলো ম্লান হচ্ছে। জয়দত্ত নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে চারিদিক লক্ষ্য করেন। পাশে দাঁড়িয়ে পুত্র।

জল পাওয়া গেছে। মাঝিদের মুখে উল্লাস ধ্বনি। বিশাল পুকুর। স্বচ্ছ-সুন্দর।

রাতের রান্না শেষ হয়। শেষ হয় আহারাদি। রাত্রি নামে। প্রদীপের আলোয় ছেলের সঙ্গে হিসাব নিয়ে বসেন জয়দত্ত। এবারের বাণিজ্য মোটেই সুবিধার হয়নি। চিন্তিত জয়দত্ত। এবারে বাণিজ্যে লাভের মুখ বোধহয় দেখা যাবে না।

গভীর রাত্রি। নিদ্রিত পুত্র। শুধু জয়দত্তের চোখেই ঘুম নেই। চিন্তায় চিন্তায় অস্থির তাঁর মন।

বণিক, তোমার নৌকায় কি আছে? কোমল নারীকণ্ঠে মৃদু প্রশ্ন ভেসে এল।

অন্ধকার বনভূমির দিকে চেয়ে আছেন জয়দত্ত। অগ্রহায়ণে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে। বহু অর্থের প্রয়োজন।

বণিক, তোমার নৌকায় কি আছে? আবার সেই প্রশ্ন।

এবার শুনতে পেলেন জয়দত্ত। নারী কণ্ঠস্বর। একটু অবাক হলেন তিনি। তাকালেন চারিধার। কেউ নেই। ভুল শুনেছেন তিনি। ঘুমন্ত পুত্রকে ডেকে তুললেন তিনি। জানতে চাইলেন, দাঁতনের মহাজন তাঁর পুরাতন প্রাপ্য মিটিয়েছে কিনা।

পুত্র বলল, না।

একথা তুমি আমাকে জানাওনি কেন? জানতে চাইলেন জয়দত্ত।

পুত্র উত্তর দিল, আমি মনে করেছিলাম আপনি জানেন। বণিক আমাকে বলেছিলেন আপনার সঙ্গে তাঁর সমস্ত ব্যাপারে কথা হয়ে গেছে।

বরক্ত হলেন জয়দত্ত। নিজের প্রতিই বিরক্ত হলেন তিনি। ভাগ্য খুবই খারাপ চলছে তাঁর। যে দিকে নিজে দৃষ্টি না দিচ্ছেন, সেদিকেই লোকসান। মিছিমিছি একটা রাত্রি এই জঙ্গল বাস।

বণিক, তোমার নৌকায় কি আছে? আবার সেই নারীকণ্ঠের প্রশ্ন।

স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল তাঁর। বললেন, ছাই আছে!

কথাটা বলেই চমকে উঠলেন তিনি। একি বললেন? কাকে বললেন?

সামনে তাকালেন জয়দত্ত। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন প্রশ্নকারিণীকে। এক কৃষ্ণাঙ্গী কুমারী কন্যা। মুখের হাসি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। স্তব্ধ পাষাণের মত নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

রাত্রি প্রভাত হল। আকাশে নবীন সূর্যের রক্তরাগ। পাখির কলকাকলিতে বনভূমি মুখর। নিজে গিয়ে পিছিয়ে পড়া নৌকাটির তদারক করে এলেন জয়দত্ত। চিন্তিত তিনি। দ্বিপ্রহরের আগে যাত্রা করা সম্ভব হবে না।

ফিরে এসে যা দেখলেন তাতে তাঁর বাহ্য জ্ঞান লোপ হবার উপক্রম

হল। তাঁর সমস্ত নৌকা ভর্তি শুধু ছাই আর ছাই। একি হল ! একি সর্বনাশ !

কানে এল কোলাহল। দূরে পুকুরের ধারে রান্না বসিয়েছিল মাঝির দল। নদী থেকে মাছ ধরে কেটে পুকুরে ধুতে গিয়েছিল একজন। খণ্ডিত মাছগুলো জীবন্ত আকার ধারণ করে জলে চলে গেছে।

এ যে ভোজবাজি। ভৌতিক কর্মকাণ্ড। মনে পড়ল রাতের কথা।

নারীকণ্ঠের প্রশ্ন, বণিক তোমার নৌকায় কি আছে ?

ছাই আছে। বলেছিলেন তিনি। তাই হল।

সর্দার মাঝিকে ডাকলেন তিনি। বললেন, নোঙর তোল।

কিন্তু রান্না ?

থাক রান্না।

পিছনের নৌকাটা…।

পরে আসবে। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল তাঁর।

এ-এ-এই নৌকা খোল। দুহাত মুখে দিয়ে চিৎকার করে উঠল সর্দার মাঝি।

নিজের নৌকায় উঠে এলেন জয়দত্ত। কিন্তু একি ? পুত্র শয্যায় শুয়ে আছে। ডাকলেন তিনি। সাড়া নেই। গায়ে হাত দিলেন। ঠাণ্ডা—মৃত ! পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন তিনি, এই নৌকা থামাও !

থেমে রইলো নৌকা। পুত্র শোকে উন্মাদ জয়দত্ত। মাঝির দল জয়দত্তের পুত্রকে সুধাকুণ্ডে নিমজ্জিত করল। মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হল অচিরেই।

জয়দত্তের চোখের সামনে থেকে সরে গেল অন্ধকারের যবনিকা। মনে পড়ল তাঁর কুমারী কন্যার কথা। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন তিনি। স্বপ্নে দেবী স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

পরদিন জয়দত্ত লোকজন সংগ্রহ করে জঙ্গল পরিষ্কার করলেন। অতি প্রাচীন এক বিরাট শ্বেত শিমূলের তলায় দেবীর শিলাময় মূর্তি, শ্রীচরণ-যুগলের ছাপ বিশিষ্ট একখানি শিলা আর শিবলিঙ্গ পেলেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করে দেবীর মন্দির ও ভোগের ব্যবস্থা করলেন।

নৌকা ভরা ছাই আবার দ্রব্য-সম্ভারে ভরে উঠল। বণিক জয়দত্ত আবার সুদিনের মুখ দেখলেন।

তারাপীঠের ইতিহাসে এমন বহু ঘটনার কথা শোনা যায়। সত্য-মিথ্যার বিচার করবে মন। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তো মনের এক্তিয়ারে। মন খোঁজে আশ্রয়স্থল—অবিশ্বাস তার কাম্য নয়। অন্ধত্ব কে চায়!

মনের জায়গা স্বচ্ছ-সুন্দর। আত্মার আত্মীয় হলে দিনের সূর্য দেবে অজানা পথের সন্ধান।

তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ। অনেকের মত তারাপীঠ বাহান্ন পীঠের অন্তর্গত। শুনেছি একান্ন পীঠের কথা। পণ্ডিতরা বলেন বাহান্ন পীঠ। অজ্ঞের তর্ক শোভা পায় না। তাঁরা নমস্য।

কথিত আছে ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠদেব নীলাচলে শুদ্ধাচারে বহুযুগ তারাদেবীর সাধনা করেও সিদ্ধিলাভে অক্ষম হন। বিফল মনোরথ হয়ে তিনি ব্রহ্মার কাছে ফিরে যান। প্রশ্ন করেন, পিতা কেন আমার সিদ্ধিলাভ ঘটছে না? কোথায় আমার ত্রুটি আপনি আমাকে বলে দিন।

ব্রহ্মা বলেন, তোমার কোন ত্রুটি তো আমি দেখছি না পুত্র।

তাহলে কেন আমার সিদ্ধিলাভ ঘটছে না পিতা? কাতর কণ্ঠে জানতে চান বশিষ্ঠ।

ব্রহ্মা স্মিত হাস্যে বললেন, পুত্র, তুমি কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে গিয়ে সাধনা কর।

বশিষ্ঠ জানতে চাইলেন, এবার আমার সিদ্ধিলাভ ঘটবে তো পিতা?

ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, সবই ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা।

বশিষ্ঠ কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে গিয়ে কঠোরভাবে সাধনা শুরু করলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পার হল। তবু সিদ্ধিলাভ হল না। ম্লান-বিষণ্ণ বশিষ্ঠ চিন্তা করেন। মনে পড়ে পিতার কথা। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে স্মিত-হাস্যে পিতা বলেছিলেন, সবই ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা।

তবে কি ব্রহ্মময়ী তারার ইচ্ছে নয় তাঁর মন্ত্রে তিনি সিদ্ধিলাভ করুন?

তবে কি সব মিথ্যা, দীর্ঘ দিনের পণ্ডশ্রম?

বশিষ্ঠের মন যখন নানান চিন্তায় অস্থির এমন সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটলো যাতে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। কিন্তু বশিষ্ঠ ব্রহ্মা দত্ত তারাবীজকে অভিসম্পাত করলেন, এই বীজে কেউ কোনদিন সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না।

বশিষ্ঠের অভিসম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ঘনালো দুর্যোগের ঘনঘটা। কেঁপে উঠল মেদিনী। শুরু হল মহাপ্রলয়।

স্তব্ধ বশিষ্ঠ প্রকৃতির রুদ্র মূর্তির দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। দীর্ঘ দিনের সাধনা তাঁর মিথ্যা নয়। জগন্মাতা শক্তিরূপা মহাদেবী তারা তাহলে আছেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি সত্য, ব্রহ্মময়ীও মিথ্যা নয়।

বৎস বশিষ্ঠ।

মহাপ্রলয়ের মধ্যেই বশিষ্ঠের কানে এল মাতৃকণ্ঠের সুমধুর আহ্বান। তিনি চতুর্দিকে তাকালেন।

বৎস বশিষ্ঠ।

তুমি কে? চিৎকার করে উঠলেন বশিষ্ঠ।

আমাকেই তো তুমি খুঁজছো বৎস।

তুমি কোথায় মা? আকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

আমি তোমার কাছেই রয়েছি বৎস।

যদি থাক, দয়া করে একবার দেখা দাও মা।

তা হয় না বৎস। সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে আমাকে পাওয়া যায় না। বৎস তুমি আমার উপাসনার আচার জান না তাই সিদ্ধি-লাভে বঞ্চিত হয়েছো।

মা! আর্তনাদ হয়ে উঠলেন বশিষ্ট।

হ্যাঁ বৎস। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বললেন, আমার সাধনার আচার শিক্ষা লাভের জন্য তুমি মহাচীনে যাও, সেখানে বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন তোমায় শিক্ষা দেবেন।

মা—মাগো। চিৎকার করে উঠলেন বশিষ্ট।

কোন সাড়া নেই। ধীরে ধীরে থেমে গেল মহাপ্রলয়। মেঘমুক্ত হল আকাশ। বিষণ্ণ চিত্তে বশিষ্ট মহাচীনের পথে যাত্রা করলেন। মহাচীনে পৌঁছে বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনের কাছে আপন অভিপ্রায় জানালেন।

বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনের কাছে শিক্ষা শেষে তারাপীঠে এলেন বশিষ্ট। নতুন করে শুরু করলেন সাধনা। দীর্ঘকাল সাধনার পর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পূর্ব-দিনে শুক্লাচতুর্দশীতে মায়ের দর্শন লাভ করেন।

আর বামদেব? তিনি কি কোন দিন লাভ করেছেন মাতৃদর্শন?

অবিশ্বাসী মন, এ কেমন প্রশ্ন তোর? কেমন করে প্রশ্ন করিস তিনি কি মা তারার দর্শন লাভ করেছেন কোনদিন!

কবে তিনি দেখেছেন মাকে, কখন, কোথায়?

সুধাতীর্থে কখন তিনি পেয়েছিলেন মাকে—কেমন করে?

সেই শিশু, যে শিশু জন্মেছিল শিবচতুর্দশীর দিন রাত্রিশেষে, সেই শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো। বাপ মায়ের প্রথম সন্তান না হলেও প্রথম পুত্র-সন্তান।

শিশু বড় হচ্ছে। মুখে আধো-আধো কথা। বা-বা, মা-মা। মায়ের 'চয়ে বাবার প্রতিই টান বেশি। বাবাকে দেখলেই আয়ত উজ্জ্বল দুই চোখে হাসি উপচে পড়ে। দু হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নেন বাবা।

মা দেখেন। হাসেন। স্বামীকে বলেন, ছেলের টান দেখছি বাবার ওপরই বেশি।

জানেন সর্বানন্দ। বলেন, আমিই তাই দেখছি।

সেই কথাই তো বলছি। বলেন রাজকুমারী।

খুব অন্যায়। ছেলেকে বুকে চেপে বলেন সর্বানন্দ। সমর্থন করেন স্ত্রীর কথার।

রাজকুমারী বলেন, তা হোক বেঁচে থাক।

দুঃখ করছো ?

কিসের দুঃখ ?

ওই যে বাপের ওপর টানের জন্যে ?

না, দুঃখ কিসের ? হাসেন রাজকুমারী।

হাসেন সর্বানন্দ। বলেন নিশ্চই তুমি দুঃখ পাও রাজকুমারী। কিন্তু ভুলে যাও কেন ছেলের সঙ্গে যে তোমার নাড়ির টান গো। ছেলে দেখিয়ে তোমার বাবা-বাবা করছে কিন্তু মন পড়ে আছে মায়ের কাছে। তুমি শুধু মা নও তো—তুমি যে প্রকৃতি।

একটু বড় হতেই সর্বানন্দ ছেলেকে নিয়ে তারামায়ের মন্দিরে যাতায়াত শুরু করেন। অবাক শিশু মুগ্ধ চোখে দেখে মাকে—দেখে মানুষ। সুখী-দুঃখী কত মানুষ! মা মা ডাকে আকাশ বাতাস মুখরিত। তারই মাকে কেউ বা কেঁদে বুক ভাষায়। স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনা করে। তারামার কাছে মনের দুঃখ জানায়।

শিশু দেখে। অবাক দুই চোখ। মন্দির প্রাঙ্গণে ঘুরে ঘুরে দেখে মানুষকে। দেখে মানুষের শোক-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রকাশ। দেখে মাকে। লোল জিহ্বা, রক্তমাখা মুখ, পিঙ্গল জটাজাল। হাস্যমুখী।

নিজের মনেই হাসে শিশু। হেসে হেসে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায় মন্দির প্রাঙ্গণে। সঙ্গী হয় শিশুর দল। সুধাতীর্থ মুখর হয়ে ওঠে শিশুদের কলকণ্ঠে। হাসে খেলে মনের আনন্দে মেতে থাকে তারা।

দেখেন সর্বানন্দ। দেখে মুগ্ধ হন।

এক সময় শেষ হয় শিশুর খেলা। ঘরে ফিরতে হবে। পুত্রকে নিয়ে আটলার পথ ধরেন সর্বানন্দ।

ছেলের শুকনো মুখ দেখে রাজকুমারী জানতে চান, হ্যাঁ গো, ওকে কিছু খাইয়েছিলে ?

না তো। বলেন সর্বানন্দ। ওতো খেতে চায়নি।

বাড়ি ফিরে দিদির সঙ্গে খেলা শুরু করেছে ছেলে। রাজকুমারী বলেন, ও খাবে বলে তোমার উড়াণীতে যে আমি ওর জন্যে গুড়-মুড়ি বেঁধে দিয়েছিলাম। তাই তো। দেখেন সর্বানন্দ। খেয়াল হয়নি তাঁর। ছেলে খেলায় মেতে খেতে চায়নি।

রাজকুমারী ছুটে গিয়ে ছেলেকে খেতে দেন। খাইয়ে দেন নিজের হাতে যত্ন করে। এ যে তাঁর পাগল ছেলে। খিদে তেষ্টা নেই, কান্না নেই, শুধু হাসি আর হাসি। নেই কোন বায়না। নেই হিংসে।

ছোট বোনকে কোলে তুলে নিয়ে মা বলেন, জানিস খোকা আমি তোর বোনটাকে খুব ভালবাসি।

ছেলে বলে, ভালবাসো ?

মা বলেন, ভীষণ ভালবাসি।

বোনকে ?

বোনকে খুব ভালবাসি।

আমাকে ?

তোকে একবারে ভালবাসি না।

দিদিকে ? জানতে চায় শিশু।

মা বলেন, হ্যাঁ, দিদিকেও ভালবাসি।

আমাকেও। বলে শিশু।

না রে, সত্যি আমি তোকে ভালবাসি না।

আমি জানি। হাসি মুখে বলে শিশু।

মার প্রতি অগাধ বিশ্বাস শিশু সরল মনে। সে বিশ্বাসের জন্ম তার মনে, অন্তরের অন্তস্থলে।

শিশু বড় হয়। আত্মভোলা সর্বানন্দ সদা মগ্ন মায়ের নামগানে। সংসার বাড়ছে। পুত্র কন্যা ছটি। অভাব অনটন লেগেই আছে। কিছু বললেই মানুষটি হেসে বলেন, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। ভাবছো কেন, তারা মা আমাদের না খাইয়ে রাখবেন না।

সত্যই তাই। এ সংসারে কেউ অভুক্ত থাকে না কোন দিন।

বাপ গান গায়। ছেলে বাপের সঙ্গে গলা মেলায়। ছোট ছেলেটাও বাপ-দাদার কাছ ঘেঁসে বসে।

তার ওপর আছে বামার পুতুল খেলা। দিনের পর দিন। ক্লান্তি নেই—বিরক্তি নেই। বিরক্ত করে মাকে। মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়ে। বনের ফুল দিয়ে ঠাকুর সাজায়। ফল নৈবেদ্য সাজায় আপন খেয়ালে। ডাকে মা-মা বলে।

রাজকুমারীকে গিয়ে উদ্ব্যস্ত করে মারে বার বার। জানতে চায়, মা-ঠাকুর কথা বলে না কেন মা?

ডাকো, ডাকলেই মা কথা বলবে। কর্মব্যস্ত রাজকুমারী উত্তর দেন।

কেমন করে ডাকতে হয় মা?

কেমন করে আবার?

কেমন করে ডাকলে ঠাকুর সাড়া দেবে একটু বলে দাওনা মা। ছেলের গলায় আকুলতা।

মা বলেন, যেমন করে আমাকে ডাকিস, তেমনি করে ডাকগে যা।

ডাকলে ঠাকুর সাড়া দেবে?

নিশ্চই দেবে।

ছেলে ছুটে যায়। মা বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলেন। পাগল।

ছেলে তাঁর। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ওই যেন কেমনধারা। তাই তাঁর মনটা ওই পাগলের জন্যে সদা সর্বদা চিন্তা করে। তারা মার কাছে ওর জন্যে মঙ্গল কামনা করেন। সব সন্তানই তাঁর কাছে সমান। তবু ওই পাগলের জন্যে কোথায় যেন একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে!

ও যেন কেমন! কেমন বুঝতে পারেন না রাজকুমারী। বড় সরল, বড় নির্মল, বড় বিশ্বাসী।

বড়-বড় দুই চোখে ওর উদাস দৃষ্টি। মনে হয় সব সময় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওর মন। বোধ হয় তারাপীঠে। মুখে সব সময় ওর তারা মার কথা। তাঁর ক্ষেপা ছেলে।

বুকটা ভরে যায় রাজকুমারীর।

সংসারে অনটন চরমে। সর্বানন্দ নির্বিকার। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। পাশের গ্রামে গুরুমশাইয়ের পাঠশালা। গ্রামের ছেলেরা পাঠশালে যায়। যায় না রাজকুমারীর ছেলে দুটি। বড় খেদ বড় দুঃখ তাই রাজকুমারীর মনে।

স্বামীকে একদিন বলেন তিনি, হ্যাঁগো ওরা কি পাঠশালে যাবে না?

কে রামচন্দ্র? বলেন সর্বানন্দ। ও তো এখনও শিশু। দু'একটা বছর যাক তারপর পাঠশালে যাবে।

আমি তোমার বড় ছেলের কথা বলছি। ওর তো পাঠশালে যাবার বয়েস অনেক দিন হয়েছে।

হাসেন সর্বানন্দ। বলেন, তাই বল, তুমি বামার কথা বলছো।

কেন ও কি পাঠশালে যাবে না? পৈতে হয়ে গেছে। লেখা-পড়া একটু না শিখলে বামুনের ছেলে যজমানের পূজাআর্চা করবে কেমন করে সেটা একবার ভেবে দেখেছো?

কিন্তু আমি তো ওকে পড়া শিখিয়েছি।

সে তো মায়ের নামগান।

কেন রামায়ণ মহাভারতও তো ওর মুখস্থ হয়ে গেছে।

হোক। শক্ত হন রাজকুমারী। বলেন, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। কালই ওদের পাঠশালে দিয়ে আসতে হবে তোমাকে।

সর্বানন্দ প্রমাদ গোনেন। বলেন, কাল কি করে হবে বলতো?

কেন, অসুবিধা কোথায়?

সর্বানন্দ ইতস্ততঃ করেন। বলেন, বলছিলাম কি পাঠশালে যাবে। কালি তৈরি করতে হবে। তালপাতা কাটতে হবে। কাল থাক পরশু পাঠশালে দিয়ে আসবো।

মনে মনে হাসেন রাজকুমারী। মুখে বলেন, কাল তাহলে পাঠশালে নিয়ে যাবে না,

কি করে যাই বল। ওই কালি তৈরি, তালপাতা……

রাজকুমারী বলেন, কালি আমি তৈরি করে রেখেছি।

ভাল, ভাল। কিন্তু তালপাতা চাই তো।

সেটাও সর্বেশ্বরকে বলে দিয়েছি।

সর্বানন্দের ভাগচাষী সর্বেশ্বর। বড় ভাল মানুষ। সর্বানন্দ পরিবারের সেও একজন যেন। সবচেয়ে ভালবাসা তার আত্মভোলা ছেলেটার ওপর। পাড়ার ছেলেরা ওকে ক্ষেপা বলে—ক্ষেপায়। সর্বেশ্বর আগলে রাখে সাধ্যমত।

পরদিন দুই ছেলেকে নিয়ে পাঠশালে ভর্তি করে দিয়ে আসেন। সর্বেশ্বর সঙ্গে যায়।

গুরুমশাই দেখেন ছেলে দুটিকে। ছোটটি বড়ই ছোট। বড়টি আট চালার এক কোণে বসে আছে চুপচাপ। শান্ত-নির্বিকার। বড় বড় দুই চোখে উদাস দৃষ্টি।

গুরুমশাই কাছে ডাকেন। জিজ্ঞাসা করেন, নাম কি তোমার?

বামা চরণ। শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বালক।

তোমার বাবা এখানে পাঠ শেখবার জন্যে দিয়ে গেছেন।

জানি।

বাড়িতে কি করতে, খেলা?

বামাচরণ চুপ করে থাকে।

অ-আ, ক-খ জান?

জানি।

লিখতে জান?

জানি।

কি লিখতে শিখেছো একটু লিখে নিয়ে এসো তো।

বালক নিজের জায়গায় ফিরে আসে। পরের কলম দিয়ে তাল-পাতায় লেখে একের পর এক।

গুরুমশাই আবার ডাকেন। দেখেন ছেলের লেখা। বলেন, এসব কি লিখেছো তুমি?

হাসে বালক। উজ্জ্বল মধুর হাসিতে চোখ মুখ ভরে যায়। উত্তর দেয়, কেন তারা মার নাম।

তারা পাগলের বংশ, কিছুই হবে না এ ছেলের। সর্বেশ্বরকে বলেন, শোন হে, ওর বাপকে বলে দিও কাল থেকে ছেলেকে আর পাঠশালে পাঠাবার দরকার নেই।

কেন গুরুমশাই? হাত জোড় করে জানতে চায় সর্বেশ্বর।

কেন, সে তুমি বুঝবে না। ও ছেলেকে মানুষ করা আমার সাধ্য নয়। গুরুমশাই বলেন, ওর বাপকে বলে দিও আমি বলেছি ও ছেলের কিছু হবে না।

রাস্তায় এসে রাগ চড়ে যায় সর্বেশ্বরের মাথায়। দুম দুম করে কিল চড় মারে ছেলেটাকে। সর্বানন্দ কোন দিন তাঁর ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তোলেননি কিন্তু সর্বেশ্বর যত কোমল, ততো কঠিন। ছেলেটা সব থেকে জ্বালায় তো বেশি তাকে। রাগের মাথায় পিঠে

পাচন বাড়ি মারতেও সে কসুর করে না। কাঁদে ছেলেটা। দুঃখ হয় সর্বেশ্বরের। সেও কাঁদে আড়ালে।

পাঠশাল থেকে বিতাড়িত বালক কিন্তু সর্বেশ্বরের মার খেয়ে কাঁদে না। অবাক চোখে সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, মারলে কেন সর্বেশ্বর দাদা ?

বেশ করেছি। রাগে গর্জে ওঠে সর্বেশ্বর। তোমার মত ছেলেকে মেরে ফেলাই দরকার।

কেন গো ?

গুরুমশাই কি বললে শুনলে না।

কেন শুনবো না, পাঠশালে যেতে তো মানা করে দিলেন।

খুব মজা না ?

মজা আর কি। তোমার কষ্ট কমলো।

আমার কষ্ট ? অবাক হয় সর্বেশ্বর ছেলের কথা শুনে।

কষ্ট নয় ? রোজ-রোজ পাঠশালে এলে তোমায় সঙ্গে আসতে হোত। তার চেয়ে এই ভাল হল।

কথা শুনে সর্বেশ্বর হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। লোকে বললেও তার মন সায় দিতে চায় না, সত্যি ছেলেটা পাগল! বোকা-সোকা বলে কষ্ট হয় তার। সে কষ্ট আরো বেড়ে যায়।

মা জিজ্ঞাসা করেন, পাঠশালে আজ কি শিখলি বাবা ?

বালক হেসে বলে, কি শিখলুম কি গো মা ? পণ্ডিত মশাই বললেন, আমার নাকি সব শেখা হয়ে গেছে, আমার আর পাঠের দরকার নেই। তিনি আমাকে পাঠ পড়াতে পারবেন না।

অবাক হয়ে গালে হাত দেন মা। বিস্মিত কণ্ঠে হাসতে চান, কেন ?

কেন কি করে বলবো বলতো ? লিখতে দিলেন, লিখে দিলুম বড় মার নাম। ব্যাস পাঠ শেষ। শেষ পাঠ তারা নাম!

ছেলের কথা শুনে মা হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পান না।

সর্বানন্দও ভেবে পান না তিনি কি করবেন। সদ্য বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়কালীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যেটা তাঁর হাহাকার করে ওঠে। চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। না, তারামার কাছে আছড়ে পড়েন না, পথ খোঁজেন। তিনি ভাবতে পারেন না এইটুকু মেয়ে, স্বামী কি—সংসার কি, যে জানলো না ; সারা জীবনের বৈধব্য যন্ত্রণা সে কেমন করে সহ্য করবে ?

একদিন স্ত্রীকে বলেন, আমি আবার মেয়ের বিয়ে দেব।

কথাটা শুনে চমকে ওঠেন রাজকুমারী। বলেন, বিয়ে ?

হ্যাঁ বিয়ে। বলেন সর্বানন্দ। মেয়ের তিনি আবার বিবাহ দেবেন, করবেন প্রকৃত পিতার কর্তব্য পালন।

স্ত্রী বলেন, কিন্তু সমাজ কি মেনে নেবে ?

না নেবে না। জানেন সর্বানন্দ। তবু তিনি সমাজপতি, গ্রামের মোড়লদের কাছে তাঁর মনোবাসনা জানালেন। বললেন, আপনারা যদি অনুমতি করেন আমি কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।

পল্লী মোড়ল বলেন, বেশ তো, ভাল কথা। বিয়ে দেবেন মেয়ের সে তো সুখের কথা। এতে অনুমতির কি আছে।

আমি তাহলে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করি ?

নিশ্চই-নিশ্চই।

আমি কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ের কথা বলছি। বলেন সর্বানন্দ।

শুনেই মোড়লের চক্ষুস্থির। একি অনাচার! মানুষটার কি মাথার ঠিক নেই ? বিধবার বিয়ে! অসম্ভব। এ কোন দিন হয় নি, হতে পারে না। মোড়ল বলেন, বিধবার বিয়ে হতে পারে না।

কেন মোড়ল মশাই ?

কেন জানি না। যা কোন দিন হয়নি তা কি করে হবে ?

কে বলেছে বিধবার বিয়ে কোন দিন হয়নি। আর বিধবা কাকে বলবো ? স্বামী সংসার যে কিছুই বুঝল না তাকে কেমন করে বিধবা

বলি? যুক্তি দেখালেন তিনি। নজির তুলে ধরলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের। তুলে ধরলেন শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু কে শোনে পাণ্ডিত্যের বিচার।

মোড়লের সাফ কথা, ওসব শাস্ত্র-টাস্ত্র ছেড়ে দিন। বিধবা বিবাহ শুধু অন্যায় নয়, মহা পাপ। সমাজ রসাতলে যাবে তাহলে।

ম্লান মুখে ফিরে আসেন সর্বানন্দ। সমাজপতি-গ্রাম্য মোড়লদের তিনি কোন মতেই রাজি করতে পারেন না। বুকটা ভেঙ্গে যায় তাঁর। কন্যার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে হাহাকার করে ওঠে অন্তর।

রাজকুমারী স্বামীর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে জানতে চান, কি হল?

ম্লান হাসেন সর্বানন্দ।

পাড়ায় কিন্তু আমাদের ঠেকো করে দেবে।

কেন? স্ত্রীর কথা শুনে জানতে চান সর্বানন্দ।

মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছো বলে।

গম্ভীর হন সর্বানন্দ। বলেন, শুধু মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছি বলেই ঠেকো করে দেবে?

রাজকুমারী ম্লান কণ্ঠে বলেন, পাড়ায় তাই তো শুনছি।

হাসেন সর্বানন্দ। বলেন, মেয়ের বিয়ে যদি দিতে পারি তাহলে নিশ্চই বাস তুলে দেবে?

রাজকুমারী বলেন, তাহলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকবো কোথায়?

কেন তারামার মন্দিরে। সেখানেও যদি জায়গা না হয় শ্মশানে। সেখানে তো ঠেকো হওয়ার কোন ভয় নেই। কেউ বলবে না এখানে কেন থাকছো? হাসেন সর্বানন্দ। প্রাণখোলা হাসি। বলেন, ও জন্যে চিন্তা করি না। জগন্মাতার কোল তো তার সব ছেলেমেয়ের জন্যে। মায়ের কাছে পাপ-পুণ্য নেই—নেই পাপী-তাপী। মায়ের সন্তানকে মা ঠিকই দেখবেন।

কিন্তু ওৎ পেতে থাকা দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। সর্বানন্দের বেশ কিছু জমি-জায়গা আত্মসাৎ করে নেয় তারা। দেখেন তিনি।

বিবাদ করেন না। কি হবে মিছে বিবাদ করে। মায়ের যা ইচ্ছে তাই হবে। শুধু দুঃখ যদি মেয়েটার বিয়ে দিতে পারতেন।

সেও তো মায়ের ইচ্ছে। ভাবেন সর্বানন্দ। সবই তো ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই তিনি বলেছিলেন, তুই বেঁচে থাক মা, তোর ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক।

কথাটা বলে প্রশান্ত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন ভৈরব। মুখে হাসি। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন কিশোরী কন্যাটির দিকে। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কিন্তু যাকে বলা সে কথা শুনে কেঁদে আকুল। কাঁদছে পিতা।

এতো আচ্ছা জ্বালা! ভাবেন তিনি। ক্ষীরের খাবার নিয়ে এসেছে বাপ বেটিতে। খেয়ে ভাল লেগেছে। আশীর্বাদ করেছেন। খুশি হবে কোথায়। কাঁদে কেন?

সেদিন তারাপীঠের মহাশ্মশান এক হতভাগিনীর করুণ কান্নায় মুখর হয়ে উঠেছিল। উপস্থিত বাবার ভক্তরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল নিজেদের মধ্যে। মেয়েটি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে তো কাঁদছেই।

মানুষগুলির মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চাইছেন তিনি। এ কান্নার রহস্য কি? কাঁদে কেন মেয়েটা। হ্যাঁ মা কাঁদিস কেন তুই? কি করলুম আমি তোর? আমি তো বলছি তোকে বড় সুন্দর করে তৈরি করেছিস ক্ষীরের পিঠে।

কথা শুনে মেয়েটি আরো জোরে কেঁদে ওঠে।

কাঁচুমাচু হন সাধক। বলেন, ওরে মা, আমি তো কোন অন্যায় কথা বলিনি তোকে, তুই তবু কাঁদছিস কেন মা? আমি বলছি মা কোন ভয় নেই তোর, তারামা আমায় যা বলতে বলেছে আমি তাই বলেছি। তোর নিশ্চই ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে।

একথা শোনার পর মেয়েটি আবার কেঁদে উঠলো। মেয়ের কান্নার সঙ্গে আবার যোগ দিল মেয়ের বাবা।

এ তো মহাসমস্যা। আনন্দেও মানুষ কাঁদে কিন্তু এ কান্না তো আনন্দের প্রকাশ নয়। তবে? ওরে তোরা বল না মেয়েটা কাঁদে কেন?

বাবা ওকে আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে বলে আশীর্বাদ করলেন।

হ্যাঁ, বাবা করলাম তো।

কিন্তু বাবা তা কি করে হবে।

কেন হবে না বাবা?

বাবা ও যে বিধবা, ওর ছেলে হবে কি করে?

নিশ্চই হবে, তারা মা বলেছে—কেন হবে না! মা, তুই কাঁদিসনি মা, শান্ত হ, তারা যখন বলেছে তখন একটা দুটো ছেলে নয় মা তোর অনেকগুলো ছেলে হবে।

বাবা বালবিধবার ছেলে হয় না, তা আশীর্বাদ করলে কি হবে?

নির্বাক্ হয়ে গেলেন সাধক। ভাবতে লাগলেন। পিতা কন্যার কান্না শুনে দুঃখ হল তাঁর। আশীর্বাদ করাটা অন্যায় হয়েছে ভেবে কাতর কণ্ঠে বললেন, মা তুই আমাকে ক্ষমা কর মা, আমি জানতুম না যে বিধবার ছেলে হয় না। আমার কি দোষ বলতো মা? তারা মা আমাকে বললে, ক্ষেপা ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক বলে আশীর্বাদ কর, আমিও তাই বললাম, আমার কথা তুই বিশ্বাস কর মা। আর তুই কাঁদিস নি মা, আমার দেখে কষ্ট হচ্ছে।

শিশু সরল কাতরতা দেখে পিতা কন্যা চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে গেল।

মিথ্যা হল কি তারাপীঠ ভৈরবের আশীর্বাদ?

না, মিথ্যা হয়নি তাঁর আশীর্বাদ। তাহলে যে মিথ্যা হয়ে যাবে তারা নাম। কলঙ্কিত হবে সুধাতীর্থ।

কিছুদিন পরে একদিন সকালে একখানা পালকী এসে থামল

শ্মশানের সামনে। পালকী থেকে ফুট-ফুটে ছেলে নিয়ে নামল মা, পিছনে স্বামী। সুন্দর স্বাস্থ্যবান নবীন যুবক। হাতে মাটির হাঁড়ি।

তারাপীঠ ভৈরব বসে আছেন পাদপদ্মে। ঘিরে বসে আছে কজন ভক্ত, ধর্মরাজের দল।

মেয়েটি কাছে গিয়ে পুত্রকে বাবার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলো। প্রণাম করল স্বামী। অবাক চোখে তিনি চেয়ে রইলেন। মুখে মৃদু হাসি।

মেয়েটি মৃদু কণ্ঠে বলল, বাবা আশীর্বাদ করলেন না?

আশীর্বাদ! চিন্তিত দেখাল তাঁকে। চোখ বুজলেন, বললেন, তুই কে মা?

আমি তো আপনার সন্তান বাবা।

আমার সন্তান! হাসলেন তিনি। বললেন, ওরে আমার বউই নেই তো ছেলে মেয়ে থাকবে কি করে?

মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্তা হল।

হাসলেন তিনি। মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল। বললেন, কিরে চুপ করে রইলি কেন?

মেয়েটি বলল, আমি আপনারই সন্তান বাবা।

না মা, তুই মায়ের সন্তান, তারা মার সন্তান, জগন্মাতার সন্তান। আমার কোন সন্তান নেই। আমিই তো তারা মার সন্তান। আমি বেটি তোরও সন্তান। তোরা তো আমার মা।

মেয়েটি স্বামীর কাছ থেকে হাঁড়ি নিয়ে মিষ্টি আনিয়ে দিলেন তাঁর সামনে। খেলেন তিনি। বেশ খেলেন। বললেন, বেশ করেছিস মা। বড় সুন্দর করেছিস। বেশ খেলুম।

এক সময় প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল স্বামী স্ত্রী। মায়ের মন্দিরে যাবে। দুঃখ মনে। ধনবান স্বামী পেয়েছে, পুত্র পেয়েছে কিন্তু যাঁর কৃপায় পেয়েছে তাঁরই কিছু মনে নেই।

মেয়েটি বলে, বাবা আপনার কি কিছুই মনে নেই?

কি মনে থাকবে মা, কি কথা বলছিস ?

একদিন আপনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। সেদিন আমি খুব কেঁদেছিলাম।

কেন কেঁদেছিলি মা ?

সেদিন বিধবা আমাকে ওই আশীর্বাদ করেছিলেন আপনি ?

না মা, আমি আশীর্বাদ করিনি। যা করেছিলেন মা-ই করেছিলেন। সেদিন মা তোকে কাঁদতে কাঁদতে পাঠিয়েছিলেন, আজ এসেছিস হাসতে হাসতে। মা যে কখন কাকে কাঁদায়—কাকে হাসায় মা-ই জানে। মাকে ডাক, প্রাণভরে ডাক। সব কান্না হাসি হবে। সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।

গভীর রাত্রি। বিশ্বচরাচর গভীর ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই শুধু রাজকুমারীর চোখে। অসুস্থ স্বামীর মাথার কাছে জেগে বসে আছেন তিনি। কদিন যাবৎ সর্বানন্দ শয্যাশায়ী। মন ভেঙ্গে গিয়েছিল কন্যার বৈধব্যে, শরীর ভাঙ্গতে শুরু করেছিল গ্রামের মানুষের চক্রান্তে। সেদিন সকালে বেহালা নিয়ে বেরুচ্ছেন, রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শরীর ভাল নয়, কোথায় চললে।

সর্বানন্দ উত্তর না দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। রাজকুমারী পীড়াপীড়ি করেননি।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছিল। চিন্তিত হয়েছিলেন রাজকুমারী। এমন কেউ নেই যাকে একবার মানুষটার খোঁজ নিতে পাঠান। সর্বেশ্বর মাঠে গেছে সেই ভোরে, ফিরবে সন্ধ্যায়। ছোট ছেলে নিতান্ত বালক, মাত্র পাঁচ বছর বয়স। বড়টি কখন কোথায় থাকে সে নিজেও জানে না। যদিও বেশির ভাগ সময় কাটে তার তারাপীঠে। কখনো মায়ের মন্দিরে—কখনো শ্মশানে। ঘোরে শ্মশানে আগত সাধু-সন্ন্যাসীদের আশেপাশে। ফাইফরমাস খাটে। গাঁজা সেজে দেয়। মায়ের

কানে আসে সে এখন গাঁজাট্যাঁজাও খায়। খেয়াল-খুশির অন্ত নেই তার। পরনের এক বস্ত্রে দিনের পর দিন কাটে। কোন দিন স্নান করে কোন দিন করে না। তবে সন্ধ্যা হলেই প্রতিদিন ঘরে ফেরে। ভোরের আলো ফুটলে বহু দিনই তাকে ঘরে দেখা যায় না।

সন্ধ্যেবেলা রাস্তা থেকেই চেঁচায়, মা খিদে পেয়েছে দুটি ভাত দাও।

রাজকুমারী জানতে চান, সারাদিন কোথা ছিলি?

এক গাল হাসে ছেলে। বলে, সে অনেক বিত্তান্ত। অনেক দূর গেসলুম। জবর এক সাধু দেখে এলুম। কি গাঁজায় টান মা যদি দেখতে। প্রতি টানে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে কলকেতে।

তুইও খেয়েছিস তো?

লজ্জিত ছেলে বলে, সাধু বাবা প্রসাদ দিলে, না করি কেমন করে। নাও খিদে পেয়েছে বড় দুটি ভাত দাও।

আয় ভাত দিচ্ছি। কিন্তু বাবা কদিন চান করিসনি বলতো?

তাই তো! স্নান করার কথাটাই মনে ছিল না। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। পৌষের কনকনে ঠাণ্ডা, ছেলে ছুটলো স্নান করতে। মা বললেন, ওরে সর্বনাশ করিসনি বাবা। এই শীতে ওই পুকুরে ডুবিসনি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ছেলে ততোক্ষণে পুকুরে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছে। হাসিমুখে কাঁপতে কাঁপতে এসে বলেছে, নাও চান করে এসেছি, ভাত দাও।

পাগল ছেলে। সাধে কি মানুষে ক্ষেপা বলে। যখন যা মনে হবে তাই করা চাই।

সেদিন কিন্তু দুপুরেই ফিরে এল বামাচরণ।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে বামা তোর বাবা কোথায় গেছে জানিস?

বাবা তো তারা মায়ের মন্দিরে বসে গান করছে।

দেখেছিস তুই ?

না তা দেখিনি। আমি আজ তারা মার মন্দিরে যাইনি।

তাহলে কোথায় ছিলি তুই ?

আমি তো শ্মশানে ছিলুম।

তাহলে জানলি কেমন করে তোর বাবা তারা মার মন্দিরে ?

কেন, বাবার গান যে শুনতে পেলুম। বাবা আজ বড় সুন্দর গাইছে গো মা। বড় সুন্দর। চোখ ফেটে জল আসে।

সন্ধ্যার আগেই তারাপীঠ থেকে ফিরে এলেন সর্বানন্দ। সেই শেষ। রাতে খাওয়া দাওয়া করে শুলেন। পরদিন সকালে অনেক বেলা হওয়া সত্ত্বেও স্বামীকে শয্যা ত্যাগ করতে না দেখে প্রমাদ গোনেন রাজকুমারী। গায়ে হাত দিয়ে দেখেন প্রচণ্ড জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে।

রাজকুমারী ডাকেন ছেলেকে, বামা—বামা!

সর্বানন্দ চোখ ঠেলে স্ত্রীর দিকে চেয়ে জানতে চান, ওকে ডাকছো কেন ?

একবার কবরেজের কাছে পাঠাবো। বলেন রাজকুমারী।

সর্বানন্দ হাসেন। বলেন, কবরেজ ডাকতে হবে না। সামান্য জ্বর। ও এমনিই ভাল হয়ে যাবে।

তিন দিনের মাথায় গভীর রাতে চোখ মেলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন সর্বানন্দ। প্রদীপের আলোয় অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন রাজকুমারীর দিকে।

কিছু বলবে ? জানতে চাইলেন স্ত্রী।

বলবো। বললেন সর্বানন্দ। ছেলেমেয়েরা ঘুমাচ্ছে ?

হ্যাঁ।

বামা ?

বামাও ঘুমাচ্ছে।

ওদের একবার ডাক। বললেন সর্বানন্দ, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

রাজকুমারী ছেলেমেয়েদের ডাকলেন। ঘুম চোখে উঠে এল সকলে। ছেলে মেয়েদের চেয়ে চেয়ে দেখলেন তিনি। মুখে হাসি। সকলকে কাছে ডেকে একে একে মাথায় হাত রাখলেন। মায়ার বন্ধন। তাঁর সন্তান। সময় হয়েছে, চলে যেতে হবে সকলকে ফেলে।

ছেলেরা শুতে চলে যাবার পর সর্বানন্দ স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন, রাজকুমারী।

স্বামীর মুখের দিকে স্থির চোখে তাকালেন রাজকুমারী।

আমার যাবার সময় হয়েছে। আমাকে যেতে হবে। জগন্মাতার ডাক এসেছে।

চলে যাবে। মৃদু কণ্ঠস্বর রাজকুমারীর।

হ্যাঁগো। জানি কষ্ট হবে তোমার। এতগুলো নাবালক ছেলে মেয়ে।

রাজকুমারী নীরব। পাষাণ।

মা তারার ওপর ভরসা রেখো। তিনি ঠিক পার করে দেবেন। অভুক্ত তিনি নিশ্চই রাখবেন না।

রাজকুমারী চুপ।

সর্বানন্দ চোখ বুজলেন। মুখে তারা নাম।

রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। সর্বানন্দ এক ভাবে তারা নাম করে চলেছেন। বাইরে শিবাধ্বনি শোনা গেল। শেষ প্রহরের ডাক।

রাজকুমারী স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলেন, শুনছো?

সর্বানন্দ চোখ মেলে একবার তাকালেন। মুখে মৃদু হাসি। চোখ বুজলেন তিনি।

শেষ।

একদিন সর্বানন্দের শ্রাদ্ধশান্তি মিটলো। গেল কিছুটা জমি। অভাব অনটন রাজকুমারী যেদিন থেকে বধূ হয়ে এসেছিলেন সেদিন থেকে নিত্য দিনের ঘটনা। কিন্তু শান্তি ছিল মনে। ছিল অবলম্বন। কিন্তু এবার তিনি দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

দু-দুটি মুখ। দিনের আলো ফুটলেই ক্ষুধার্ত মুখের ছবি। বাপের মৃত্যুতে বামাচরণ নির্বিকার। সতেরো পার হওয়া আঠারো বছরের ছেলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকে। মুখে কথা নেই—হাসি নেই। কোথাও বেরোয় না। যে তারাপীঠ ছিল ও ছেলের প্রাণ, সেখানেও যায় না আর। দশবার ডাকলে একবার সাড়া পাওয়া যায়। খেতে বললে খায়। খেয়ে গিয়ে আবার বসে থাকে। দৃষ্টি উদাস। আত্মভোলা।

বোনেরা গিয়ে ডাকে, দাদা—এই দাদা।

সাড়া পায় না তারা।

মা গিয়ে ডাকেন, বামা—এই বামা।

মায়ের ডাকে চোখ তুলে তাকায় ছেলে।

কি এত ভাবছিস বলতো?

কিছু নয়।

বেলা যে অনেক হল বাবা। স্নান করে এসে দুটো খেয়ে নে।

যাই।

বলে বটে যাই কিন্তু ওঠার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। উদাস দৃষ্টিতে কখনো আকাশ, কখনো দূরের বনানীর দিকে চেয়ে থাকে। মা হাত ধরে তুলে এনে স্নান করতে পাঠায়। খাওয়ায়।

একদিন বলেন, বামা আর যে সংসার চলছে না বাবা।

কেন মা? খেতে খেতে মুখ তুলে চায় ছেলে।

কি করে চলবে বল? আগে যা জমি ছিল কোন রকমে চলে যেত বছর। এখন যে তিনটে মাসও চলবে না। একটা কিছু কর বাবা। তুই তো বাড়ির বড় ছেলে,দিন রাত এই ভাবেরসে থাকলে চলে তোর?

কিন্তু আমি যে কিছুই জানি না মা ?

তবু তো তোকে কিছু করতে হবে বাবা।

চিন্তা করে ছেলে। ভাবে দিন রাত্রি। কিছু করতে হবে। একটা কিছু করতেই হবে।

পরদিন থেকে ভাই রামচন্দ্রকে নিয়ে বেরোয়। কোন কাজ না জানুক গান জানে। বাবার সঙ্গে গিয়ে কত দিন তারামার মন্দিরে গান গেয়েছে। বাবা বেহালা বাজিয়েছেন, তারা দুই ভাই গান গেয়েছে। গান শুনে কতলোক ধন্য-ধন্য করেছে।

গ্রামের পথে পথে ঘুরে দুই ভাই দিনের পর দিন গান গেয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি। গান শুনে কেউ কিছু দিয়েছে কেউ দেয়নি।

কিন্তু এভাবেও বেশিদিন চলেনি। গান শুনিয়ে পেট ভরেনি। কোনদিন কিছু পাওয়া যায়, কোনদিন যায় না। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে দুই ভাই। নিজের জন্যে নয়, কষ্ট হয় ছোট ভাইটার জন্যে।

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা ব্যথায় টনটন করে। বলে, খুব কষ্ট হচ্ছে নারে রামচন্দ্র ?

দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করে, তোমার।

তোর জন্যে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে রাম। খিদে পেয়েছে তো ?

হ্যাঁ দাদা।

একটু পা চালিয়ে চল। ওই তো গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কোথায় গ্রাম। দুপুরের রোদ্দুরে দু ভাই পথ হাঁটে। পেটে খিদে।

যখন কিছু পাওয়া যায় না তখন মিছিমিছি গান গেয়ে লাভ কি। আবার ঘরে বসে থাকে ছেলে। ভাবে আর ভাবে। আবার বেড়িয়ে পড়ে একদিন। এবার একা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাজের সন্ধান পায় মুলটি কালীবাড়িতে।

অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটে মন্দিরে। সকাল হতেই মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

কি চাই ? প্রধান কর্মচারী জানতে চান।

একটা কাজ।

কি কাজ ?

যে কোন কাজ।

এখানে কাজ আছে কে বললে তোমাকে ?

আজ্ঞে কানে এল।

প্রধান কর্মচারী তিক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। জিজ্ঞাসা করেন নাম।

নাম বলে ছেলে।

বাড়ি ?

আটলা গ্রামে।

বাবার নাম কি ?

সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বাড়িতে কে-কে আছেন ?

মা, আর পাঁচ ভাইবোন।

বাবা ?

গত হয়েছেন।

সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে গত হয়েছেন সে সংবাদ অবগত আছেন মুলটি গ্রামের কালীবাড়ির প্রধান কর্মচারী। সর্বানন্দও তাঁর পরিচিত ছিলেন। আর কাজের লোকের সত্যই প্রয়োজন। মায়ের ভোগ যিনি রাঁধতেন পক্ষকাল হল হঠাৎ-ই তিনি গত হয়েছেন। ফুল তোলার একজন লোকেরও প্রয়োজন। এখন প্রধান পুরোহিতকে সব নিজের হাতে করে নিতে হয়। কিন্তু তা খুব বেশিদিন সম্ভব নয়। কারণ পুরোহিতের বেশ কিছু যজমান আছে। পালপার্বনে সেদিকটা রক্ষা করতে হবে তাঁকে।

কাজ একটা আছে। বলেন প্রধান কর্মচারী। মায়ের পুজোর ফুল তোলা, যোগাড় করা পারবে তুমি ?

খুব পারবো।

রাঁধতে জানো?

রান্না! জানে বৈকি। তারাপীঠ শ্মশানের কত সন্ন্যাসীর রান্না কত দিন করে দিয়েছে সে। বলে, রান্নাও জানি।

ঠিক তো?

দেখে নেবেন। হাসে ছেলে। মায়ের ভোগ ঠিক রাঁধতে পারবো।

চাকরি হয়ে যায়। কিন্তু কদিন? ভোগ হয় অর্ধ সিদ্ধ। ফুল তুলতে গেছে তো গেছেই—ফেরার নামটি নেই। অতএব চাকরি শেষ।

এরপর নবগ্রাম (সাঁইথিয়ার কাছে)।

সে বছর প্রচণ্ড খরা। রাজকুমারী দুই ছেলেকে ভাই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। ভাই বোনকে বললেন, কোন চিন্তা করিসনি তুই ছেলেদের জন্যে। ওরা আমার কাছে ভালই থাকবে। আমার ছেলে-পুলে নেই। ছেলের মত থাকবে ওরা। ওদের নিয়ে গিয়েই আমি পাঠশালে ভর্তি করে দেব। বামুনের ছেলে লেখাপড়া না শিখলে চলে।

ভাইকে বেশ ভাল করেই চেনেন রাজকুমারী। লেখাপড়ার দরকার নেই। পেটপুরে ছেলে দুটো খেতে পাক এই তিনি চান। সর্বেশ্বর যখন রয়েছে তখন ঠিক দুমুঠো খেতে পাবেন মা-মেয়ে।

যদিও ছেলেদের পাঠাতে সর্বেশ্বরের ঘোর আপত্তি ছিল। বলেছিল, তুমি কি গো মা, আমি ক্ষেপাকে কত বকি মারি আবার মন টাটায়। আর তুমি মা হয়ে থাকবে কেমন করে?

নিরুত্তর ছিলেন রাজকুমারী। সব জানেন তিনি। সব বোঝেন। ছেলেদের ছেড়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হবে। তবু উপায় নেই।

মামার বাড়ি পৌঁছে পরদিন সকাল থেকেই মামার পাঠশালায় ভর্তি হয় দুই ছেলে। বড় যায় মামার একপাল গরু নিয়ে মাঠে চরাতে। আর ছোট খাটে সংসারের ফাইফরমাস।

ক্ষেপা ছেলে একপাল গরু নিয়ে সকালে মাঠে চলে। ব্রজের রাখাল কৃষ্ণ যেন! চূড়া করে চুল বাঁধা নেই, নেই শিখি পাখা, বয়েসে পূর্ণ যুবা কিন্তু শিশুর মতই সরল নিষ্পাপ। চোখে সুদূরের আহ্বান। বুকের মধ্যে প্রতি নিয়ত ডাক শোনে, ওরে আয়-আয়।

মনের আনন্দে গরুর পাল চরে বেড়ায়। চাষীদের ফসল নষ্ট করে। মামার কাছে প্রতিদিন অভিযোগ।

সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে ফিরলেই ঘাড় ধরে মামা, হতভাগা ছেলে খাচ্ছ দাচ্ছ ঘুমাচ্ছ, গরুগুলোকে লোকের ফসল নষ্ট করছে দেখতে পাওনা?

শুরু হয় প্রহার। ছেলে নির্বিকার। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যায় দেহ, চুপ করে থাকে।

মামী বলে, আজ দুভাইয়ের খাওয়া বন্ধ।

দোষ করেছি আমি। কিন্তু ভাই কি করেছে?

মামা বলে, ও তোর ভাই।

মামী বলে, অত কথায় কাজ কি। খাওয়া বন্ধ যখন বলেছি তখন খাওয়া বন্ধ।

অভুক্ত দুই ভাই রাতের অন্ধকারে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থেকেছে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ডুকরে কেঁদে উঠেছে রামচন্দ্র। ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাদা বলেছে, আর একটু সহ্য কর ভাই রাত শেষ হল বলে।

কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ চরমে ওঠে। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মামার বাড়ির জীবন। শেষে একদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই দুইভাই মামার বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। ফিরে আসে নিজের ঘরে।

দুই ছেলেকে দেখে অবাক হন রাজকুমারী। জিজ্ঞাসা করেন, ওরে তোরা ফিরে এলি যে বড়?

হাসে ক্ষেপা ছেলে। বলে, তোমার জন্যে বড় মন কেমন করছিল মা।

কিন্তু বাবা একি চেহারা হয়েছে তোর ? অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

হাসে ছেলে। বলে, না মা আমি খুব ভাল আছি।

রামচন্দ্র বলে, দাদাকে মামী খেতেই দিত না।

কেন খেতে দিত না কেন ?

দাদা গরু চরাতে যেত। গরু অন্য লোকের গাছ খেয়ে নিত। মামা ধরে ধরে মারতো। খেতে দিত না মামী। দেখনা দাদার পিঠে কত কাটা দাগ। দাদা কিন্তু কোন দিন কাঁদেনি।

মা ছেলেকে কাছে টেনে নেন। পিঠের অবস্থা দেখে শিউরে ওঠেন। চোখ ভরে যায় জলে। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দেন পিঠের ক্ষতে।

হাসে ছেলে। মাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বোজে। তিনি যে কি ভুল করেছেন বুঝতে পারেন। বুকের মধ্যেটা তাঁর হাহাকারে ভবে যায়। কিন্তু এবার ? এবার কি করবেন তিনি ?

বলেন, হ্যাঁ বাব', এবার কি করবি ?

এবার কিছু করবো না মা। বড় মা এবার যা করাবেন তাই করবো।

মা বলেন. তাই করিস বাবা।

তাই করে বামা। গ্রামে থাকলে ঘরে থাকতে হয়। বাইরে বেরুবার কোন উপায় নেই। ব্রাহ্মণ-প্রধান আটলা গ্রামের মানুষ তাদের ঠেকো করেছে। প্রথমা কন্যা জয়কালী বিধবা হয়ে ঘরে ফেরার পর সর্বানন্দ বহু চেষ্টা করেছিলেন তার দ্বিতীয় বিবাহ দিতে কিন্তু সে চেষ্টা তাঁর ফলবতী হয়নি। দ্বিতীয়া কন্যা দুর্গার বিয়ে দিয়েছিলেন বীরভূমের হরিষাড়া গ্রামে। তৃতীয়া কন্যা দ্রবময়ীর বিবাহ দিয়েছিলেন ধলাসিন গ্রামে। মৃত্যুর কমাস আগে চতুর্থ কন্যা সুন্দরীর বিবাহ ঠিক হয়েছিল মুলটিকে। বিবাহ শেষ হল। তারপরই শুরু হল গোলমাল।

বরের বাবা সর্বানন্দকে ডেকে বললেন, বিয়ে তো হল কিন্তু যৌতুক যা দেবেন বলেছিলেন সে সব কোথায় গেল ?

আকাশ থে:ক পড়েছিলেন সর্বানন্দ। যৌতুক ? কি যৌতুক তিনি দেবেন বলেছিলেন ? কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না তিনি। কারণ অর্ধাহারে যাঁর দিন কাটে, যৌতুক দেবার সামর্থ কোথায় তাঁর।

বরের বাবা বলেছিলেন, আপনি যৌতুকের কথা বলেন নি ?

সর্বানন্দ বলেছিলেন, না।

মিথ্যে কথা বলবেন না। চারখানা গহনা দেবার কথা ছিল মেয়েকে, কিন্তু একখানাও দেননি।

সর্বানন্দ বলেছিলেন, গহনা তো দূরের কথা, একখানির বেশি দুখানি কাপড় দেবারও সামর্থ্য নেই আমার।

আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন।

আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন বেযাই মশাই। করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন সর্বানন্দ।

ভুল বুঝছি ? ডাকুন ঘটককে। বলুক সে, কি বলেছিলেন আপনি।

কিন্তু কোথায় ঘটক। অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। গোলমালটা সেই করেছিল। সর্বানন্দের অগোচরে সেই পাত্রপক্ষকে কথা দিয়েছিল। এবং বিয়ের পব গোলমাল।

সমাজ নীরব। ছেলেকে নিয়ে সেই রাতেই চলে গিয়েছিল ছেলের বাবা। সর্বানন্দের ঘরে আনন্দের পরিবর্তে উঠেছিল ক্রন্দন-রোল।

এরপর কটা দিন সর্বানন্দ চুপ করে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন। আবার সেই মানুষ, সেই সদা হাস্যময় পুরুষ। বেদনার পাষাণ ভারটা বুকের মধ্যে চেপে বসে শুধু বড় মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে।

কদিন পরে একান্তে ডাকেন তিনি রাজকুমারীকে। বলেন শোন, সুন্দরীর বিয়ের আমি ঠিক করে ফেলেছি।

বিয়ে। চমকে ওঠেন রাজকুমারী। বুকের মধ্যেটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর।

হ্যাঁ, সুন্দরীর বিয়ে।

কিন্তু ওই মেয়েকে কে আবার বিয়ে করবে?

মানুষ করবে রাজকুমারী। এখনও সমাজে তেমন মানুষ আছে। আর সুন্দরীর বিয়ের কথা বলছো, ওর কি সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া হয়েছিল?

না তা অবশ্য হয়নি। বিবাহের অনুষ্ঠানটাই শুধু হয়েছিল। তার পরই শুরু হয়েছিল গোলমাল। গ্রামের লোক কেউই সর্বানন্দের হয়ে কথা বলতে আসেনি বরং দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে, পক্ষান্তরে উৎসাহ দিয়েছে পাত্রপক্ষকে।

রাজকুমারী জানতে চেয়েছিলেন, কোথায় পাত্র ঠিক করলে?

ঠিক হয়েছে তারামার মন্দিরে।

তারামার মন্দিরে? অবাক হয়েছিলেন রাজকুমারী।

মা-ই ঠিক করেছিলেন। হেসেছিলেন সর্বানন্দ। বলেছিলেন, বৃদ্ধা সৎমাকে নিয়ে ছেলেটি মার মন্দিরে এসেছিল। ছেলেটির বাবা দুবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় দীর্ঘদিন পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী ছেলেটির জন্মের পরই মারা যায়। সৎমাই মানুষ করে ছেলেটিকে। মায়ের মন্দিরে পরিচয় হল। ঠিক হয়ে গেল বিয়ের কথা।

বাড়ি কোথা? জানতে চেয়েছিলেন রাজকুমারী।

কাসাছিতে। শিক্ষিত ছেলে। নবদ্বীপে বেশ কয়েক বছর থেকে সংস্কৃতের পাঠ নিয়েছে। জমি-জায়গা বেশ ভালই আছে। স্বচ্ছল সংসার। আমি সুন্দরীকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে আসবো।

তাই করেছিলেন সর্বানন্দ। সুন্দরীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার লোকেরা ঠেকো করেছিল সর্বানন্দ পরিবারকে। শুধু তাই নয় সর্বানন্দের মৃত্যুর পর কিছু কিছু নির্যাতনও শুরু হয়েছিল।

বামার আপন-পরে ভেদ নেই। আপন ভোলা ছেলে। কখনো নীরবে একাকী দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায় বনে-জঙ্গলে। কখনো চলে যায় চণ্ডীপুরে তারা মার মন্দিরে, শ্মশানে।

এমন সময় তারাপীঠ শ্মশানে এলেন মণি গোসাই, ব্রজবাসী কৈলাসপতি বাবা। সঙ্গে স্ত্রী।

ক্ষেপা ছেলে অবলম্বন খুঁজে পেল বহুদিন পরে। জুটে গেল কাজের মত কাজ।

ব্রজবাসী কৈলাসপতি বাবা। জটাজুটধারী গেরুয়া বসন পরিহিত সন্ন্যাসী। দীর্ঘ পুরুষ। তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। বিশাল দেহী, বিশাল চক্ষুদ্বয়। গলায় তুলসী মালা। হাতে রুদ্রাক্ষ। গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। মুখে হাসি। অমায়িক মধুর ব্যবহার।

সে সময় তারাপীঠের পাণ্ডারা এবং সমস্ত মানুষ কৈলাসপতি বাবাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করতো।

ব্রজবাসী কৈলাসপতি বাবার ভৈরবীও ছিলেন স্নেহময়ী মাতৃ-প্রতিমার মত।

ক্ষেপা ছেলে শ্মশানে ব্রজবাসীর কুটিরের আশেপাশে ঘোরে। দেখেন ব্রজবাসী। দেখেন ভৈরবী।

একদিন কাছে ডাকেন ভৈরবী। জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে বাবা?

হাসে ক্ষেপা ছেলে।

কদিন দেখছি তুমি এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এ শ্মশানে তোমার ঘুরতে ভয় করে না?

ভয় কি। বলে ক্ষেপা ছেলে। কত রাতেও আমি এখানে ঘুরেছি।

তোমার নাম কি?

নাম বলে ক্ষেপা ছেলে।

বাড়ি কোথায়?

বাড়ির কথাও বলে।

বাড়িতে কে-কে আছে বাবা তোমার?

মা, ছোট ভাই আর ক্ষেপি দিদি। হাসে ছেলে। বলে, ক্ষেপি দিদিও কিছুদিন এখানে ছিল। মা অনেক করে বলতে ঘরে ফিরে গেছে।

কেন, এখানে ছিল কেন? জানতে চান ভৈরবী।

তা জানি না। কেন ছিল তা বলতে পারবো না। আমি ওসব বুঝি না।

তা তুমি বাবা কেন এখানে ঘুরে বেড়াও? হাসি মুখে প্রশ্ন করেন ভৈরবী।

ভাল লাগে।

শুধুই ভাল লাগে বলে এখানে আসো? এ যে শ্মশান, ভয়ঙ্কর জায়গা।

হাসে ছেলে। হাসতে হাসতে বলে, অত শত জানি না। আমি তো সেই ছোট বয়েস থেকে ঘুরছি।

কেন ঘুরছো বাবা? শান্ত মৃদু কণ্ঠে হাসি মুখে জানতে চান ভৈরবী।

কিন্তু কেন এই ঘোরা, কিসের টানে, কোন্ আকর্ষণে জানে না ছেলে। শুধু ভাল লাগে। বিশাল ভয়াবহ শ্মশানে ঘুরতে ভাল লাগে। ঘন জঙ্গল, দিনের আলোর প্রবেশ অধিকার নেই, চারিদিকে নর করোটি, কঙ্কাল ছড়ানো, শবদেহ নিয়ে দিনের বেলাতেই শৃগাল কুকুরের ছেঁড়াছিঁড়ি—সে এক আতঙ্কময় পরিস্থিতি, বীভৎস চিৎকার। একবার শিবার দল শবদেহের অধিকার বজায় রাখতে ধর্মরাজের পিছনে তাড়া করে জোরে। আবার ধর্মরাজের দল পরক্ষণে শিবার দলকে তেড়ে আসে। গাছের ডালে বসে চিৎকার করে শকুনির পাল। শুনে অতি সাহসীরও বুক কাঁপে ভয়ে।

শ্মশান তো নয় রহস্যময় প্রেতপুরী। ব্রজবাসী কৈলাসপতিবাবা সেই প্রেতপুরীতে ঘর বেঁধেছেন। কিসের টানে সে ঘরের আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করে, ক্ষেপা ছেলে।

ভৈরবী বলেন, আমাকে এক কলসী জল এনে দেবে বাবা।

ক্ষেপা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ছুটে গিয়ে অমৃতকুণ্ড থেকে জল নিয়ে আসে।

কৈলাসপতি জিজ্ঞাসা করেন গম্ভীর কণ্ঠে, আমার কাছে কি চাস বাবা ?

হাসে ক্ষেপা ছেলে। জবাব দেয়, কিছু নয় শ্রীগুরুবাবা।

শ্রীগুরুবাবা! থমকান কৈলাসপতি। বলেন, হ্যাঁ বাবা, একথাটা কোথায় পেলি তুই।

হাসে ছেলে। মুখে হাসি লেগেই আছে।

গাঁজা সাজতে পারিস বাবা ?

খুব পারি।

সেজে নিয়ে আয়তো বাবা, দেখি কেমন তোর হাত।

কৈলাসপতি বশিষ্টাসনে বসে আছেন ভক্তদের নিয়ে। ক্ষেপা ছেলে ছোটে কুটীর থেকে গাঁজা সেজে নিয়ে আসার জন্যে।

কৈলাসপতি খুশি হন গাঁজা খেয়ে। হাসি মুখে বলেন, বাঃ বাঃ বাবা সুন্দর তোর হাত। গানের গলাটিও বড় সুন্দর। কিন্তু বাবা কি চাস সেইটাই শুধু জানিস না তুই।

শ্রীগুরুবাবার কথা শুনে হাসে ক্ষেপা ছেলে। হাসতে হাসতে বলে, আমি কিছুই চাই না শ্রীগুরু বাবা।

পাগল ছেলের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে মায়ের মন। যত প্রবোধ দেন নিজেকে মন কিছুতেই মানে না। পুত্রের অমঙ্গল কামনায় মাতৃ-হৃদয় বার বার অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। পাগল ছেলে আগে-আগে সারাদিন যাই করুক সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার আগেই ঘরে ফিরে যেত। ইদানীং সে ঘর ছাড়া। তারাপীঠই তার ঘর হয়ে উঠেছে। কখনো দু-একদিন কখনো বা দিনের পর দিন ঘরে ফেরে না।

রাজকুমারীর কানে অনেক কথাই আসে। শেষে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেন না তিনি। একদিন বাধ্য হয়েই ছুটে আসেন তারাপীঠে। এসে দাঁড়ান ব্রজবাসী কৈলাসপতির কুটির দ্বারে। প্রণাম করেন তাঁকে।

আপনি কে মা? প্রশান্ত কণ্ঠে অবগুণ্ঠনবতী রাজকুমারীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন কৈলাসপতি।

আমি আপনার মেয়ে বাবা। মৃদু কণ্ঠে বলেন রাজকুমারী।

বসো মা, বসো।

রাজকুমারী দাঁড়িয়ে থাকেন।

কি হল মা, বসবে না?

আমি আপনার কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি বাবা। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন রাজকুমারী।

কিন্তু মা আমি নিজেই যে ভিখারী। হাসেন কৈলাসপতি। তোমাকে দেওয়ার মত আমার তো কিছু নেই মা।

আপনি আমার বামাকে ফিরিয়ে দিন বাবা।

বামা! চমকিত হন কৈলাসপতি। তুমি বামার মা?

ও আমার পাগল ছেলে বাবা।

পাগল ছেলে। হাসেন কৈলাসপতি। বলেন, ঠিক বলেছো মা, বামা তোমার পাগল ছেলে। আমিও তো মা তোমার পাগল ছেলে।

বাবা! আর্তকণ্ঠে বলেন রাজকুমারী।

ভয় কি মা?

আপনি ওকে ফিরিয়ে দিন বাবা।

আমি? অন্যমনস্ক হন কৈলাসপতি।

হ্যাঁ বাবা। বলেন রাজকুমারী।

তুমি ভুল করছো মা। কৈলাসপতির কণ্ঠস্বর ঈষৎ গম্ভীর।

ভুল করছি?

হ্যাঁ মা, ভুল করছো। ওকে ধরে রাখার মত শক্তি তো আমার নেই মা।

বাবা! আর্তনাদ করে ওঠেন রাজকুমারী।

হ্যাঁ মা, মিথ্যে বলছি না। হাসেন কৈলাসপতি, জগন্মাতার সন্তানকে ধরে রাখি এমন সাধ্য আমার কোথায় মা? অন্তর ওর তারা-ময়। সকলে ওকে ক্ষেপা বলে কিন্তু মা ও তো ভৈরব, স্বয়ং শিব। ওকে কি আমি ধরে রাখতে পারি?

তাহলে কি হবে বাবা? কেঁদে ফেলেন রাজকুমারী।

কৈলাসপতি সান্ত্বনা দেন, দুঃখ কোর না মা, কাতর হয়ো না। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, যত দিন আমি এখানে আছি তোমার ছেলের ভার আমি নিচ্ছি। ওকে আমি দেখবো। তবে মা এই আনন্দের জগৎ ছেড়ে ও আর ঘরে ফিরবে না। সংসারের বাঁধনে বাঁধা পড়ার জন্যে ও জন্মায়নি। একদিন সংসারের হাজার হাজার দুঃখী মানুষ ওর কাছে ছুটে আসবে আনন্দ খুঁজতে, আশ্রয় পেতে। তারা-তীর্থকে ওই যে সুধাতীর্থে পরিণত করবে মা। তোমার ক্ষেপা ছেলেই মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে আলো জ্বালাবে। পথ দেখাবে দিশাহারা মানুষকে।

তবু মায়ের মন বোঝে না। কাঁদেন আর কাঁদেন। মা তারার কাছে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন।

ব্রজবাসী কৈলাসপতির কথা মিথ্যা হয়নি। সত্যসত্যই একদিন রিক্ত নিঃস্ব দুঃখী আতুর মানুষের দল ছুটে গেছে সুধাতীর্থে। কেঁদে লুটিয়ে পড়েছে ভৈরবের পদতলে। বাবা রক্ষা কর, দয়া কর, করুণা কর বাবা।

বাবা, বাবা কিরে শালা। গর্জে উঠেছেন ভৈরব। আমি কে? তারামার কাছে যা। মাকে ডাক। বাঁচতে চাস তো মাকে ধর। ওরে মা-ই তো সব। প্রাণ ভরে মায়ের কাছে কাঁদগে মা-মা বলে ডাক। বেটির কান ঝালাপালা করে দে। দেখবি মা তাকে তিতি-

বিরক্ত হয়ে ঠিক কোলে তুলে নেবে। ডাক রে ডাক মাকে ডাক। তারা—তারা।

আজও চলেছে মানুষ। ডাকছে মাকে। মা কি সন্তানের ডাক শুনতে পাচ্ছেন না? যদি নাই শুনবেন, যদি নাই টানবেন কাছে, তাহলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মায়ের লক্ষ লক্ষ সন্তান কেন ছুটে চলেছে?

কিসের নেশায়? কোন নিশির ডাক ঘরছাড়া করে নিয়ে চলেছে সুধাতীর্থে?

কেন যাচ্ছে মানুষ?

কেন?

ব্রজবাসী কৈলাসপতি তারাপীঠ ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি এমনি কখনো আসেন কখনো যান। বশিষ্টাসনের উগ্র সাধক বড় রহস্যময়। খেয়ালেরও অন্ত নেই তাঁর।

ব্রজবাসী চলে গেছেন কিন্তু পাগল ছেলে ঘরে ফেরেনি। কখনো মন্দিরে, কখনো শ্মশানে সে ঘুরে বেড়ায়। গান গায় মনের আনন্দে। কোনদিন খাওয়া জুটলো, কোনদিন জুটলো না। কি এসে গেল তাতে। নদীর জল আছে। আছে মুক্তির আনন্দ।

মা ছেলের সংবাদ রাখেন। প্রতিবেশী পিতৃবন্ধু দুর্গাদাস সরকারকে ধরেন। তিনি নাটোর সরকারের চাকুরে। তারাপীঠের ভার তখন তাঁর ওপর। রাজকুমারীর একটিই অনুরোধ, ছেলেটা দুটি খেতে পাক এই ব্যবস্থাটুকু তিনি করুন।

দুর্গাদাস সরকার খুঁজে খুঁজে ধরলেন ক্ষেপা ছেলেকে। বললেন, বামা তোর সঙ্গে কটা কথা ছিল বাবা।

বলুন কাকা।

তোকে বাবা কাজ করতে হবে।

কাজ? কাঁচুমাচু হয় ছেলের মুখ। মুক্তির আনন্দ থেকে আবার দাসত্বের শৃঙ্খল!

কিন্তু বাবা কাজ না করলে খাবি কি? কে তোকে নিত্যদিন খেতে দেবে শুনি। দিনের পর দিন অনাহারে থাকলে শরীর টিকবে কেন বল?

সত্যি কথা, খুব সত্যি কথা। কিন্তু দাসত্বের বিনিময়ে অন্নসংস্থান? চুপ করে থাকে ছেলে।

দুর্গাদাস সরকার বলেন, বৌঠান অনেক করে বললেন বলেই তোকে বলা। ঠিক আছে তাঁকে জানিয়ে দেব তুই কাজ করবি না।

কাকা।

বল বাবা।

কাজ করতে যে আমার একবারেই ইচ্ছে করে না।

ঠিক আছে—ঠিক আছে। কাজ তোকে করতে হবে না।

চুপ করে থাকে ছেলে।

দুর্গাদাস সরকার বলেন, চলি রে। আজই একটা ছেলে যেমন করে হোক যোগাড় করতে হবে আমায়। তারামার পূজার ফুল তোলার লোক যদি না পাই খুবই অসুবিধাতে পড়ে যাব।

বড়মার পুজোর ফল তুলতে হবে?

হ্যাঁ বাবা।

আমি তুলবো। আনন্দে নেচে ওঠে মন।

কিন্তু বাবা তুই তো কাজ করতে চাস না?

ফুল তোলাকে কাজ কেন বলছো গো কাকা? হাসে ছেলে। আমি ফুল তুলবো, সেই ফুলে বড়মার পুজো হবে। এ আমার কম ভাগ্যি।

হাসেন দুর্গাদাস সরকার। চেয়ে চেয়ে দেখেন বলিষ্ঠ তরুণটিকে। দেহটাই বেড়েছে—মনে শিশু। বন্ধুর ছেলে তাঁর। এই ছেলেকে সকলে বলে পাগল, ক্ষেপা। এ যে শিশু ভোলানাথ। বলেন, কাল

থেকে ভোরে মায়ের পূজার ফুল তুলবি। মনে করে দুপুরে প্রসাদ পাবি—ভুলিসনি যেন।

শুরু হল আর এক জীবন।

পাগল ছেলে মায়ের পূজার ফুল তোলে। প্রসাদ পায়। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে-মশানে। গান গায় গলা ছেড়ে। কি আনন্দ—কি আনন্দ। কোথায় দাসত্ব? কোথায়, শৃঙ্খল? এ যে মায়ের সেবা।

কিন্তু কুচক্রীর দল সর্বত্র সক্রিয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই নাটোর সরকারের মুর্শিদাবাদ রঘুনাথগঞ্জ কাছারীতে প্রধান কর্মচারী ভরত মৈত্র মশাইয়ের কাছে দুর্গাদাস সরকার আর নবনিযুক্ত পুষ্পচয়নকারীর নামে অভিযোগ যায়। মৈত্রমশাই আসেন তদন্তে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তানকে ভুলিয়ে কাছারীর পাচক নিযুক্ত করার জন্যে নিয়ে যান।

কিন্তু কদিন? কে রাঁধবে অন্ন-ব্যঞ্জন? মন যার পড়ে আছে জগজ্জননীর কাছে সে কেমন করে রাঁধবে? তিতিবিরক্ত মৈত্রমশাই বাধ্য হয়ে পাগল ছেলেকে পাঠিয়েছেন তারাপীঠে। শুধু এইটুকু করুণা তিনি করেন। সামান্য বেতনের চাকরি শেষ। প্রসাদ বন্ধ।

আটলায় ফিরে এল ছেলে। দীর্ঘদিন পরে। মায়ের বুক ভরে উঠল আনন্দে।

কিন্তু কদিন? কদিন বাঁধা থাকবে মাতৃ কোষের বন্ধনে। জগন্মাতার ডাক যার অন্তরের অন্তস্থলে বাজছে দিবানিশি সংসারের মায়ার বন্ধন তো তার কাছে তুচ্ছ।

বর্ষার রাত্রি। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বইছে পাগলা বাতাস। বিদ্যুতে হঠাৎ ঝলকানি।

ঘুম নেই শুধু পাগল ছেলের চোখে। ঘরের বাইরে দাওয়ায় অন্ধকারে ছটফট করছে সে।

রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তাঁর। বাইরে বেরিয়ে এলেন।

বামা ! মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন রাজকুমারী।

কোন সাড়া নেই।

বামা ! ছেলের গায়ে হাত রাখলেন মা।

মা !

অনেক রাত হল বাবা, এইবার শুয়ে পড়।

ঘুম যে আমার চোখে আসছে না মা। কাতর কণ্ঠে বলল ছেলে।

শুবি চল, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব।

ঘুম আমার চোখে আসবে না মা।

বামা ! ছেলেকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরেন জননী।

আমার ঘুমের দিন শেষ হয়ে গেছে মা। এবার আমার জাগরণের দিন। মাগো তুমি আমাকে মুক্তি দাও মা।

বামা ! আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন জননী।

হ্যাঁ মা। স্থির গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তুমি মুক্তি না দিলে আমি তো যেতে পারবো না মা।

বাবা আমার যে আর কেউ নেই রে। ডুকরে ওঠেন জননী। তুই চলে গেলে আমি কি নিয়ে কেমন করে থাকবো বাবা ?

কিন্তু মা আর তো আমি থাকতে পারবো না। মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আদুরে ছেলে বলে, আমি যে ডাক শুনছি। তারামা যে আমাকে সব সময় ডাকছেন, এখন তুমি যদি আটকে রাখ আমি কেমন করে যাই বলতো ?

এতো সেই পাগল ছেলের কথা নয়। এ কে ? তাঁর সন্তান ? বিদ্যুতের আলোয় চকিতে দেখেন রাজকুমারী। এ কি সেই ছোট্ট শিশুটি, যাকে তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন, লালন-পালন করেছিলেন ? এই বিরাট-বিশাল অভ্রভেদীপুরুষ কে ?

মা !

বামা।

মাগো, আমি তোমারই সন্তান মা। তুমি আমাকে দয়া করে মুক্তি দাও মা?

মুক্তি?

হ্যাঁ মা মুক্তি।

কিন্তু বাবা মুক্তি দিলেই কি মার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়?

না মা।

তাহলে কিসের মুক্তি বাবা?

সংসারের বন্ধন থেকে আমি মুক্তি চাই মা। মাতৃত্বের বন্ধন তো ছিন্ন হবার নয়। তুমিই তো জগন্মাতা মহামায়া, গৃহে তুমি জননী রূপে বিরাজিতা। আশীর্বাদ করো মা তোমার সন্তান যেন জয়ী হয়। তোমার শুভ কামনা যে চলার পথে শক্তি দেয়।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ নির্বাক পাষাণ প্রতিমার মত পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন রাজকুমারী। মৃদু কণ্ঠে বলেন, আচ্ছা বাবা এসো।

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দুর্যোগের রাতে পথে নামে পাগল ছেলে। মুক্তির আনন্দে ছুটছে সে। তারা-তারা বলে চিৎকার করছে। বাজ পড়ছে। ঝড়ের দাপটে ভাঙ্গছে গাছের ডাল। পিছল পথে আছড়ে পড়ছে বার বার। ভ্রুক্ষেপ নেই। মুখে শুধু তারা-তারা।

খরস্রোতা দ্বারকা। ফুলে ফেঁপে সর্বনাশা রূপ তার। তারা নামে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাগল ছেলে। ভয় নেই, ভাবনা নেই, নেই মোহের আকর্ষণ, শুধু লক্ষ্য এক —তারামা।

ক্ষুধায় তারা, তৃষ্ণায় তারা, বচনে তারা, শ্রবণে তারা, দর্শনে তারা, দুঃখে তারা, সুখে তারা, তারাই যে ব্রহ্মময়ী, তারা ভিন্ন গতি নেই মানুষের; তিনি যে পারের কাণ্ডারী!

পাগল ছেলে ভেসে চলেছে খরস্রোতে। জীবনের মায়া নেই, নেই যৌবনের উদ্দীপনা—দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, নেই অতৃপ্ত বাসনা।

কামনা-বাসনা ত্যাগ করে নয়, কামনা-বাসনা কি ত্যাগ করা যায়, পাগল ছেলে জানে না কামনা-বাসনা কি ; জানে শুধু মাকে। দ্বারকার খরস্রোত তো জলোচ্ছ্বাস নয়, জগজ্জননীর স্নেহের অমৃতধারা !

গৃহত্যাগ করে গেরুয়া বসনে ভোল ফেরালেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায় ? ধনাদি কামনা, বংশ কামনা, পারত্রিক কল্যাণ কামনা জয় করিয়ে বিশ্বমাতা সংসারে পাঠিয়েছেন তাঁকে। কল্যাণময়ী জননী দাঁড়িয়ে শ্মশান প্রান্তে।

প্রবল বর্ষণ তখনও সমানে চলছে। পাগল হাওয়ার মাতামাতি। বিশাল শ্মশানভূমি জুড়ে চলেছে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা। বিদ্যুতের ঝলকানিতে প্রেতের অট্টহাসি। পাগল ছেলে মহানন্দে চিৎকার করে উঠলেন তারা-তারা !

গুরুগম্ভীর তারা নাদে আপন কুটিরে চমকে উঠলেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি।

পরক্ষণেই কুটিরদ্বারে সিক্ত হাস্যময় মুখ উঁকি দিল। ডাকল, শ্রীগুরুবাবা।

বামা।

আমি এসেছি শ্রীগুরুবাবা।

এই দুর্যোগের রাতে কেমন করে এলি তুই ?

কেন সাঁতার কেটে।

ওরে পাগল একি সর্বনাশ করেছিস তুই ? তোর কি মৃত্যুর ভয় নেই ?

হাসে পাগল ছেলে। বলে, ভয় কি শ্রীগুরুবাবা। মরবো কেন ? মৃত্যু থাকলে কে বাঁচায় ?

তাই বলে এই ঝড় জলের রাতে তোর আসার সময় হল ?

আসার আবার সময় অসময় কি গো শ্রীগুরুবাবা। মুখে ফুটিফুটি হাসি। মাকে বললুম এবার আমাকে ছেড়ে দাও মা। মা ছেড়ে

দিতেই জয় তারা বলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম নদীতে। যিনি পার করাবার তিনিই পার করে দিলেন।

মুগ্ধ ব্রজবাসী কৈলাসপতি। দ্বারকার স্রোতে পরনের কাপড় ভেসে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট দিগম্বরপুরুষ! তারা মায়ের ক্ষেপা ছেলে। দুহাত বাড়িয়ে পাগল ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

ব্রজবাসী কৈলাসপতি আর মোক্ষদানন্দ। মোক্ষদানন্দও পাগল ছেলেকে প্রাণাধিক স্নেহ করতেন। সে সময় তারাপীঠে মোক্ষদানন্দ এবং ব্রজবাসীর দাপটই ছিল প্রচণ্ড। মোক্ষদানন্দের সঙ্গে ব্রজবাসীর সদ্ভাব ছিল। দুজনে দুজনকে সম্মান করতেন। কিন্তু দুজনের চরিত্র ছিল ভিন্ন। ব্রজবাসী কৈলাসপতি ছিলেন উগ্রসাধক আর মোক্ষদা-নন্দ ছিলেন কোমল স্বভাবের মানুষ। তিনি আটলা গ্রামের কাছেই থাকতেন।

ব্রজবাসী এবং বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ প্রায়ই বশিষ্ঠাসনে বসে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। অদূরে বসে পরম বিস্ময়ে দুজনের আলোচনা শুনতো পাগল ছেলে। শুনতে শুনতে মন চলে যেত কোন স্বপ্ন-রাজ্যে।

ব্রজবাসী ডাকতেন, বামা!

কিন্তু কে দেবে সাড়া? ছেলে বসে আছে স্থির হয়ে।

বামা, ও বামা।

সংবিৎ ফিরে পেত ছেলে। কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতো, কিছু বলছো শ্রীগুরুবাবা?

গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে বাবা, একটু তামাক সেজে আনবি বাবা?

এই এলাম বলে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতো ছেলে শ্মশানের অভ্যন্তরে ব্রজবাসীর কুটিরে। পরম যত্নে তামাক সেজে কৈলাসপতির হাতে তুলে দিত। তুষ্ট কৈলাসপতি মুগ্ধ হতেন সেবায়।

অনেকের মত ব্রজবাসী কৈলাসপতি বামার গুরু। সঠিক প্রমাণ কিন্তু আজও পাওয়া যায়নি। তবে বামদেব ব্রজবাসী কৈলাসপতিকে শ্রীগুরুবাবা এবং মোক্ষদানন্দকে কর্তাবাবা বলে সম্বোধন করতেন। গুরুর মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন দুজনকে। প্রাণপণে সেবা করতেন দুজনের। আর দুজনেই পাগল ছেলেটাকে স্নেহ করতেন, সাধ্যমত আগলে রাখতেন।

কারণ সে-সময় পাগল ছেলে এমন বহু কাণ্ড ঘটিয়েছিল যাতে গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মারমুখী হয়ে তেড়ে আসতো তারা। ব্রজবাসী কৈলাসপতি তাদের বুঝিয়ে ফিরত পাঠাতেন।

পাগল ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যাঁরে বামা শালগ্রাম শিলা তুই নিয়ে এলি কেন বাবা ?

আমি নিয়ে আসিনি শ্রীগুরুবাবা। ছেলেটা নিজে ডেকে আমাকে নিয়ে আসতে বললে যে।

কোন্ ছেলেটা ? জানতে চাইতেন ব্রজবাসী।

চিনি না। দেখতে সুন্দর। আমি তো রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে হাঁটছিলুম। ছেলেটা নিজেই আমাকে ডাকলে ওপরে। বললে, বামা, নারায়ণকে এরা জল পর্যন্ত খেতে দেয় না—তুই নিয়ে গিয়ে একটু জল খাইয়ে আসবি।

তুইও অমনি নিয়ে এলি ?

কি করবো শ্রীগুরুবাবা। অমন কাকুতিমিনতি করলে তুমিও নিয়ে আসতে। সরলভাবে বলেছিল ছেলে।

ঠিক আছে। বলেছিলেন কৈলাসপতি। আর অমন কাজ করিসনি কোনদিন।

আবার। দিব্যি গালতো ছেলে। বদ ঠাকুরগুলোর পাল্লায় আর পড়ছি না।

মনে থাকবে তো কথাটা ?

এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতো পাগল ছেলে। দিব্যি কাটতো। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙতেও খুব একটা দেরি হ'ত না। বিশেষ করে আটলা গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাবার পর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি। গ্রামবাসীরা রে-রে করে নদী পার হয়ে ছুটে এসেছে। পাগল ছেলে আশ্রয় নিয়েছে তাঁর কুটিরে। গ্রামবাসীদের অনেক কষ্টে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন তিনি। বৈশাখের দুপুরে প্রায় গ্রামখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের কাছে শুনেছেন পাগলটা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়েও পড়েছিল। অবাক হননি তিনি। কিন্তু মানুষের এই ভাবে ক্ষতি করা তো ঠিক নয়। এ ঘোর অন্যায়।

কুটিরদ্বারে এসে কৈলাসপতি ডেকেছিলেন, বামা, বামা!

ভৈরবী বেরিয়ে এসে জানতে চেয়েছিলেন, কি হল?

বামাকে এধারেই আসতে দেখেছি। কি করছে সে?

ঘুমাচ্ছে।

ঘুমাচ্ছে?

হ্যাঁ, কোথা থেকে ফিরে এল খানিক আগে। এসে কি কান্না। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা।

ডাকো ওকে।

আহা ঘুমাক না বেচারা।

নিশ্চই ঘুমাবে কিন্তু মানুষের কত বড় সর্বনাশ করে এসেছে সে, তার কোন খোঁজ রাখো!

কার কি সর্বনাশ করলো সে?

আটলা গ্রামটাকে আগুনে পুড়িয়ে এসেছে।

কেন?

সেটাই আমি তার কাছে জানতে চাই। যদি সে এমন করে আমার কাছে আর ঠাঁই নেই তার। ডাক তাকে।

ডাকতে হয় না। ভয়ে জড়োসড়ো কৈলাসপতির রুদ্রমূর্তির

সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ায় পাগল ছেলে। দুই চোখ জবা-ফুলের মত লাল। সমস্ত দেহ ধূলি-ধূসর।

বামা। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি।

শ্রীগুরুবাবা। ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেয় ছেলে।

মানুষের কি সর্বনাশ যে তুই করেছিল জানিস?

আমার কোন দোষ নেই শ্রীগুরুবাবা।

চুপ কর।

বিশ্বাস করো শ্রীগুরুবাবা।

বিশ্বাস। তুই আটলা গ্রামে আগুন লাগাসনি।

লাগিয়েছি শ্রীগুরুবাবা।

কেন আগুন লাগিযেছিস?

আমাকে তারামা যে আগুন দিয়ে আসতে বললে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে ছেলে।

তারা মা তোকে আগুন দিয়ে আসতে বলেছে? বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান ব্রজবাসী কৈলাসপতি।

বিশ্বাস করো শ্রীগুরুবাবা। আমার কোন দোষ নেই। আমি একটা কথাও মিথ্যে বলছি না। আমি শ্মশানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম। তারামা এসে বললে, বামা তুই মহাবীর হনুমান হয়ে আটলা গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড করে আয়। আমিও কিছু না ভেবে আগুন দিতে ছুটলুম। এখন দেখছি তারামাটা ভীষণ বদ। আমি ঠিক করেছি আর কোন দিন তারামার কোন কথা শুনবো না।

কিন্তু আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলি কেন?

গ্রামের লোক যে বললে, তোর বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

তাহলে এখানে এলি কেমন করে আগুনের মধ্যে থেকে?

তা তো জানি না। হাসে পাগল ছেলে। বোধ হয় তারামা-ই নিয়ে এসেছে।

—ব্রজবাসী কৈলাসপতি স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সরল

পাগল ছেলেটার দিকে। বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না, আবার অবিশ্বাস করতেও পারেন না তিনি। তারা মায়ের পাগল ছেলেটার পক্ষে সবই সম্ভব!

কাশী যাবেন মোক্ষদানন্দ আর কৈলাসপতি। সেখান থেকে হরিদ্বার। পাগল ছেলে শুনে বায়না ধরল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

কৈলাসপতি বললেন, তুই সঙ্গে গেলে ভৈরবীমাকে কে দেখবে বাবা?

আমার যে অন্নপূর্ণাকে দেখতে বড় সাধ শ্রীগুরুবাবা।

না বামা তোর যাওয়া হবে না। তোর কষ্ট হবে।

হোক কষ্ট। আমি যাব।

মোক্ষদানন্দ বললেন, বলছে যখন, তখন চলুক।

ভৈরবীও বললেন, যাবে বলছে যখন ছেলেটা, নিয়ে যাও।

কাশী চললেন তিনজনে। কাশী পৌঁছালেন একদিন। কাশী কিন্তু ভাল লাগল না পাগল ছেলের। বড় নোংরা—দুর্গন্ধ। এর চেয়ে তারামার বাড়ি অনেক ভাল। সেখানে কত আলো-হাওয়া, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বিশাল শ্মশানে কি শান্তি—কি শান্তি। গঙ্গার চেয়ে দ্বারকা কত পবিত্র। এখানে দিনরাত্রি শুধু হৈ-চৈ—শুধু দাও-দাও রব। মা অন্নপূর্ণার কাছে শুধু দেহি-দেহি!

কিন্তু তারামা? সেখানে কিছু চাইতে হয় না। মা দেবার জন্যে সর্বক্ষণ হাত প্রসারিত করে আছেন। শুধু যাবার অপেক্ষা। একবার পৌঁছাতে পারলেই হল। শূন্য হাতে কেউ ফেরে না। মা যে জগত-জননী। সন্তানকে কখনো বিমুখ করেন না।

ব্রজবাসী কৈলাসপতি কাশী পৌঁছেই সেই দিনই রাতের গাড়িতে হরিদ্বার রওনা হয়ে গেলেন। মোক্ষদানন্দ কাশীতে থাকবেন। ব্রজবাসী ফিরে এলে একসঙ্গে তারাপীঠ ফিরবেন।

পাগল ছেলে কিন্তু দুদিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল কাশীতে। মোক্ষদা-নন্দকে বলল, আমার কাশী ভাল লাগছে না। এখানে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। আমি তারাপীঠে ফিরে যাব।

মোক্ষদানন্দ বলেন, তা কি হয়, আগে ব্রজবাসী আসুক।

আমি থাকবো না। আমার ভাল লাগছে না।

ভাল যদি লাগছে না, তাহলে এলি কেন ?

ভুল করেছে। তারা মাকে ছেড়ে এসে ভুল করেছে পাগল ছেলে। মাকে ছেড়ে এসে ভীষণ অন্যায় করেছে।

মোক্ষদানন্দ বোঝান অনেক। কটাদিন চোখ বুজে কাটিয়ে দে। ব্রজবাসী ফিরলেই তারাপীঠ ফিরবে তারা।

কিন্তু বোঝানোই সার। যে বোঝার সে বুঝলে তো! শুধু কান্না আর কান্না। দিনরাত্রি তারামার জন্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে মাতৃহারা শিশুর মত পাগলছেলেটা।

এরই মাঝে মোক্ষদানন্দের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। শান্ত স্বভাব অমায়িক মোক্ষদানন্দের আসল রূপ প্রকাশ পায়। বেরিয়ে পড়ে আর এক মোক্ষদানন্দ। বেদজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষদানন্দ। অহঙ্কার যার গগনচুম্বী!

কিসের অহঙ্কার গো তোমার—শিক্ষার? পরনে গেরুয়া বসন, সন্ন্যাসী বলে পরিচিত। মানুষ দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তুমি যে অহঙ্কারের দাস।

আমি তারামার দাস। তারামার সন্তান। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস আহার-নিদ্রা সবই তারামার। আমি তারা ময়। আমার সবই তারা। তারা নামের নদীতে আমি নিমজ্জিত। আমার উত্থান নেই, পতন নেই। আমি স্থিরও নই—গতিশীলও নই। আমি যে কি আমি তা জানি না। আমি শুধু জানি তারা। আমার দেহ মন আত্মা সবই তারা।

আমি বসে আছি বহু দূরে—মন পড়ে আছে আমার সুধাতীর্থে। আমি শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে দেখছি মাকে। আমি জগন্মাতার সন্তান—আবার তিনিই আমি।

পাগল ছেলের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মোক্ষদানন্দ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। বলেন, মূর্খ পাষণ্ড তুই আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস, বেদজ্ঞ ব্রহ্মণকে বেদ শেখাচ্ছিস। তারা বেদ।

হাসে পাগল ছেলে। বলে, শিক্ষার কি শেষ আছে গো। তারা মায়ের সংসারে জানার কি শেষ আছে।

তুই কি জানিস?

আমি কিছুই জানি না। জানি শুধু তারা।

তুই দূর হয়ে যা।

কোথায় যাব গো।

যমের বাড়ি যা।

হাসে পাগল ছেলে। বলে, বেশ বলেছো কর্তাবাবা। কিন্তু সেখানেও তো নেই তারা।

তাড়িয়ে দেন মোক্ষদানন্দ। কপর্দকশূন্য অবস্থা। রেলগাড়ি থেকে টিকিট না থাকার অপরাধে নামিয়ে দেয় চেকার। তাতে কি আছে। পয়সা নেই তো কি হয়েছে। পথ রয়েছে—পা রয়েছে। চল, হাঁটো।

হাঁটে পাগল ছেলে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, গান গায়।

পথে কোন দিন খাওয়া জোটে—কোন দিন জোটে না। পশ্চিমের শীত রাতের অন্ধকারে শরীরে দাঁত ফোটায়। দিনের সূর্য ওঠে রাতের অন্ধকার দূর করে। পাখি ডাকে। শোনা যায় মায়ের ডাক।

ওরে আয়-আয়-আয়।

অবশেষে একদিন দেখা যায় মন্দিরের চূড়া। কি আনন্দ কি আনন্দ।

পাগল ছেলে ফিরে আসে আপন ঘরে। মা দুবাহু বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয় ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত সন্তানকে।

কাশী যাত্রার মধ্যেই ঘটে গেছে সেই ঘটনা। ক্ষেপি দিদি নেই। জয়কালী তারাপীঠে সমাধিস্থ হয়ে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে। শুনে

স্থির নীরব পাষাণের মত ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থাকে পাগল ছেলে। পরক্ষণে মুখে ফুটে ওঠে হাসি। জয় তারা। মাগো সত্যই তুমি করুণাময়ী। কত দয়া তোমার মাগো। কি অসীম ভালবাসা।

একদিন তারাপীঠে ব্রজবাসী কৈলাসপতি আর মোক্ষদানন্দ ফিরে এলেন। ব্রজবাসী ফিরে এলেন বটে কিন্তু হঠাৎ-ই একদিন তাঁকে আর দেখা গেল না। ভৈরবী সহ তিনি কখন কিভাবে কোথায় যে চলে গেলেন মোক্ষদানন্দও বলতে পারলেন না। অনেকের ধারণা তারা মায়ের ক্ষেপা ছেলের সিদ্ধির পর তিনি আকাশ পথে তারাপীঠ ত্যাগ করেন।

কিসের সিদ্ধি, কিসের সাধনা? জন্মসিদ্ধ সাধক। দেহ, মন, আত্মা যার তারা ময়, তিনি জপে ধ্যানে কি ভাবে এগিয়েছেন তাঁর সাধনপথে? কে তাঁর গুরু? ব্রজবাসী কৈলাসপতি? মোক্ষদানন্দ?

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সে সময় ব্রজবাসী কৈলাস-পতি এবং মোক্ষদানন্দ তারা মায়ের পাগল ছেলেটিকে সাধ্যমত আগলে থাকতেন। ব্রজবাসী চলে যাওয়ার পর মোক্ষদানন্দ দীর্ঘ দিন তারাপীঠে থাকেন, তারাপীঠেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

কখনো কোমল, কখনো কঠিন, কখনো নম্র, কখনো উগ্র। দিনে-দিনে ভিন্ন মূর্তি। বিশাল শ্মশানভূমি:ত একলা সাধক। স্থানীয় লোকেরা বলে ক্ষেপা। দিগম্বর বিশাল পুরুষ। খেয়াল খুশির অন্ত নেই। গভীর জঙ্গলে কখনো দিনের পর দিন লুকিয়ে থাকে কেউ দেখতে পায় না। কি খায় কি করে—কে বলতে পারে! আবার কখনো মায়ের মন্দিরে এসে একদিন ভোগ খেয়ে যায়। শুধু অন্ধকার গভীর রাতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে ডাকে পাগল ছেলে, তারা—তারা!

কখনো শ্মশানের অভ্যন্তর থেকে ওঠে কান্নার ধ্বনি। করুণ আর্ত হাহাকার। কখনো বা তর্জন-গর্জন। তারাপীঠের মানুষের রাতের নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভেঙ্গে শিশু জড়িয়ে ধরে মাকে।

গভীর রাতে কাঁদে মায়ের পাগল ছেলে। সেই কান্নার সুরে সুর মেলায় শ্মশানের শিবার দল আর সঙ্গী কুকুরগুলি। সর্বক্ষণের সঙ্গী

কালুর দল। সব সময় কাছে কাছে। এক মুহূর্তের জন্যে ছেড়ে থাকে না।

কদিন পরে মন্দিরে চলেছে পাগল ছেলে। খাবার কথা মনে পড়েছে। প্রচণ্ড ক্ষিদে। সঙ্গে চলেছে কালুর দল।

মায়ের ভোগরাগের আয়োজন সম্পূর্ণ। থরে থরে সাজানো পঞ্চব্যঞ্জন। দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে পুরোহিত কথা বলছেন একজন বিশিষ্ট যাত্রীর সঙ্গে। বাজছে ঢাক-ঢোল-সানাই।

পাগল ছেলের কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সোজা মন্দিরে উঠে গিয়ে দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে মায়ের ভোগ খেতে শুরু করে দিয়েছে। আঃ, বাঃ-বাঃ, বড় সুন্দর রান্না হয়েছে আজ। খাচ্ছে আর হাসছে। বড় খুশি। কদিন পরে পেট ভরে খাওয়া গেল। জয় তারা।

যাত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করে মন্দিরের দিকে তাকিয়েই পুরোহিতের চক্ষুস্থির। সর্বনাশ, একি অলুক্ষণে কাণ্ড। হায়-হায় করে ওঠে পুরোহিত। পাগলের মত চিৎকার শুরু করে দেয়।

কিন্তু যার উদ্দেশ্যে চিৎকার সে আপন খেয়ালে খেয়ে চলেছে। হাসছে। বাঃ, বড় সোন্দর রেঁধেছে পায়েসটা। আঃ, পেট ভরে গেল।

পুরোহিত সমানে চিৎকার করে চলেছেন, ওরে হতভাগা একি সর্বনাশ করলি তুই। মাগো, একি অনাচার তোমার মন্দিরে মা! হায়-হায় এখন কি হবে। আমি কি করবো?

পাগল ছেলের খেয়ে আজ বড় তৃপ্তি। পেট ভরেছে। এবার সর্বক্ষণের সঙ্গীদের জন্যে কিছু নিয়ে যেতে হবে। ওরা নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। মন্দির লোকে লোকারণ্য। পুরোহিতের চিৎকারে যে যেখানে ছিল সব ফেলে ছুটে এসেছে। পাগল ছেলে নির্বিকার। এত হৈ-চৈ, চিৎকার কিছুই কানে যায়নি তার। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ

নেই। সঙ্গীদের জন্য ভোগের গামলার দিকে হাত বাড়াতেই দুজন দারোয়ান পিছন থেকে জাপটে ধরে। হিড় হিড় করে টেনে নামায় মন্দির থেকে।

অবাক হয় পাগল ছেলে। এ আবার কি! এরা এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেন? কি করেছে সে?

বাঁধ এবার ব্যাটাকে। চিৎকার করে ওঠে পুরোহিত। ব্যাটা পাজি-নচ্ছার। মায়ের ভোগ তোকে জন্মের মত খাইয়ে দিচ্ছি। ক্ষেপামী তোর শেষ করে দেব আজ।

পুরোহিতের আদেশে বাঁধা হয় পাগল ছেলেকে। শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। দুজন দারোয়ান মারছে তো মারছে। ক্ষত-বিক্ষত সমস্ত শরীর। আঘাতে ফুলে গেছে চোখ মুখ সর্বশরীর। গল-গল করে রক্ত বেরুচ্ছে। যাত্রী আর জড়ো হওয়া মানুষগুলো শিউরে উঠছে সে দৃশ্য দেখে। কিন্তু তারা নিরুপায়। নাটোর রাজসরকারের নিয়োজিত প্রধান পুরোহিত। তারামার মন্দিরের তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি পৈশাচিক উল্লাসে লাফাচ্ছেন আর চিৎকার করছেন, মার-মার, মেরে ফেল, শেষ করে দে।

প্রহারের প্রচণ্ডতায় আর্তনাদ করে ওঠে পাগল ছেলে, না-না, ওগো আর তোমরা আমায় মের না গো। আমার কথা বিশ্বাস করো, সত্যি বলছি আমার কোন দোষ নেই। দুচোখে অশ্রুধারা, যন্ত্রণায় ছটফট করে।

চিৎকার করে ওঠেন প্রধান পুরোহিত, মারবে না। শয়তান, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। পাগল সেজে থাকার মজা তোকে দেখাচ্ছি। ভণ্ড, প্রতারক। বলছিস, মা তোকে খেতে বলেছে। এখন কোথায় তোর মা? বাঁচাক তোর মা এসে।

বিশ্বাস করো ঠাকুরমশাই। আমি সত্যি বলছি। কদিন খাইনি, ভীষণ খিদে পেয়েছিল। মা বললে মন্দিরে ভোগ রয়েছে, গিয়ে খেয়ে আয় না। কাঁদতে কাঁদতে করুণ কণ্ঠে বললে পাগল ছেলে।

আর তুমিও অমনি এসে খেতে বসে গেলে। ভেংচে উঠলেন পুরোহিত। দেখবো এবার কে তোকে মায়ের প্রসাদ খেতে দেয়। দরোয়ানদের ছেড়ে দিতে বলে পুরোহিত শাসায়, আর যদি কোনদিন তোকে মন্দিরে দেখি তাহলে ঠ্যাং ভেঙ্গে জন্মের মত খোঁড়া করে দোব বুঝলি।

খুব বুঝেছে পাগল ছেলে। রক্তমাখা শরীর। চোখের জলে বুক ভাসছে। কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলে শ্মশানের দিকে। ছলছল চোখে সঙ্গে চলে সঙ্গীদল।

পাগল ছেলে মন্দির ছেড়ে চলে গেছে। যাবার পথে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের আলপনা। একজন যাত্রী মৃদু কণ্ঠে পুরোহিতকে বলেন, আহা! ঠাকুর মশাই ওই ভাবে মানুষকে মারে!

মানুষ! গর্জে ওঠেন পুরোহিত। ওটা মানুষ নাকি, পাকা শয়তান। পাগল সেজে থাকে। মুখে তারা-তারা, তারা মাকে যেন ও হতে দেখেছে। ভণ্ড, প্রতারক। এই এত বেলায় তারা মার ভোগ উচ্ছিষ্ট করে আবার বলে কিনা মা আমায় খেতে বলেছে। তারা মার পুজো করতে করতে আমি তো বুড়ো হতে চললুম, কই মা তো আমাকে কোন দিন নিজে খাবার আগে আমাকে খেতে বললেন না? পাগলের পাগলামী নয় ভণ্ডামী।

যাই হোক, ব্রাহ্মণের ছেলেকে দরোয়ান দিয়ে ওই ভাবে মারাটা আপনার উচিত হয়নি ঠাকুরমশাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন যাত্রীটি।

বামুনের ছেলে? গর্জে ওঠেন পুরোহিত। ওর কি জাত বেজাত আছে নাকি। ও ম্লেচ্ছ—ভণ্ড, শ্মশানে গিয়ে দেখুন গে শেয়াল কুকুরের সঙ্গে এক সঙ্গে গলাগলি করে খাচ্ছে। মদ, ভাঙ, গাঁজা কি খায় না ও। যতো ইতোর ছোটলোক ওর সঙ্গে ঘোরে।

যাত্রীটি চুপ করে যান। পুরোহিত বলেন, আগে দয়া করতুম। হোক পাগল, পেটটা আছে তো। মন্দিরে এলে খেতে দিতুম। এবার এলে সত্যি সত্যি ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।

কান্না ব্যথার নয়, অভিমানের। শ্মশানের গভীরে মাটিতে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে পাগল ছেলে। মা নয়—রাক্ষসী। খেতে বলে মার খাওয়ালে। আর যদি কোন দিন খেতে বলে, কোন শালা খায়। শেষ খাওয়া খেয়েছে আজ ছলনাময়ীর ছলনায়। আর এজীবনে মুখে অন্ন তুলবে না। মরে যাবে? জন্মেছে যখন একদিন তো মরতেই হবে—দুদিন আগে আর পরে। আমি কি বলেছিলুম খিদে পেয়েছে খেতে দাও—নিজে খেতে বলে আবার······

চোখের জলে বুক ভাসে। দিন শেষ হয়ে রাত্রি নামে, শেষ হয় না কান্না। সঙ্গীর দল ঘিরে বসে থাকে। হাজার চেষ্টা করে কান্না ভোলাবার কিন্তু কান্না তবু থামে না।

একি স্বপ্ন-না সত্য? একি দেখলেন তিনি। নিদ্রাভিভূতা নাটোরের মহারানী অন্নদাসুন্দরীর সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে। শয্যায় উঠে বসেন তিনি। ঘামে সর্ব শরীর সিক্ত হয়ে গেছে তাঁর। দিশাহারা হয়ে ওঠেন তিনি। ভেবে পান না কি করবেন।

অনেকক্ষণ নিথর ভাবে বসে থাকেন অন্নদাসুন্দরী। গভীর রাত্রি। সেজবাতির মৃদু আলোয় বিশাল কক্ষটি মায়াময়। স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। স্বপ্ন না বিভীষিকা। একি তাঁর মনের ভুল? কিন্তু···না-না, মিথ্যা নয় সত্য। ডুকরে কেঁদে ওঠেন রানীমা। মা এসেছিল। তারাপীঠ মন্দিরের গন্ধ ছড়িয়ে আছে কক্ষে।

রানীমার কান্না শুনে বৃদ্ধা দাসী ছুটে আসে। মা, কি হয়েছে মা?

কিছু হয়নি। নিজেকে সামলে নেন অন্নদাসুন্দরী। দাসীকে বলেন, তুই বাইরে যা।

দাসী চলে যেতে স্বপ্নের কথা চিন্তা করেন অন্নদাসুন্দরী। এ স্বপ্ন না সত্য? তারাপীঠের তারামা মন্দির ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন কৈলাসে। বিষাদগ্রস্তা মায়ের দুচোখ দিয়ে বেয়ে বিগলিত ধারায়

অশ্রু ঝরছে, মুখে হাসি নেই, অধরে নেই স্নেহ বিলাস, প্রশান্ত ললাটে কারুণ্যের টিকা। মা ত্রস্তা, শীর্ণা, শোকগ্রস্তা। কোমল পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত। রুধির লোলুপা গৃধিনী ও শিবা মায়ের পশ্চাতে রুধির লালসায় উপবিষ্টা।

কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিলেন রানীমা, একি বিভীষিকা দেখাচ্ছ মা, কোন্ অপরাধে তুমি আমাদের ত্যাগ করে যাবে?

বৎসে, বহু যুগ-যুগান্তর হতে এই মহাপীঠে আমি বিরাজিতা, তোর পুরোহিত আমার প্রিয় পুত্রকে প্রহার করেছে। তাকে প্রহার করেনি, করেছে আমাকেই—এই দেখ আমার পিঠ ক্ষত-বিক্ষত।

মাগো, অপরাধ মার্জনা কর মা। বল মা, কে তোমার প্রিয় পুত্র?

সে তো আমার কাছেই আছে।

মা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, বল মা, কি করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?

আমার পাগল ছেলেকে ওরা চারদিন প্রসাদ খেতে দেয়নি, তাই আজ চারদিন আমিও ভোগ গ্রহণ করিনি।

সে কি মা তুমি উপবাসী?

হ্যাঁ। সন্তান না খেলে মা কি খেতে পারে। শোন, আমার ভোগের আগে যদি আমার পাগল ছেলের ভোগের ব্যবস্থা করিস, তাহলেই আমি তারাপীঠে থাকবো।

দেবীর কথা শুনে রানীমা বললেন, তাই হবে মা। আগামী কালই আমি এর ব্যবস্থা করবো।

ভেঙ্গে গেল ঘুম। দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন অন্নদাসুন্দরী। সেই রাত্রেই রাজাকে বললেন তাঁর স্বপ্নের কথা। সেই রাত্রেই রাজার হুকুমে জলে ভাসলো একশো মল্লার ছিপ। রাজ সরকারের দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নাটোর থেকে যাত্রা করলেন তারাপীঠ উদ্দেশ্যে।

পরদিন।

দিনের সূর্য মধ্য গগনে। প্রধান পুরোহিত মায়ের পূজা শেষ করে

ভোগ নিবেদন করতে যাবেন, নাটোর সরকারের কর্মচারী দুজন বাধা দিলেন তাঁকে। বললেন, ঠাকুর মশাই, মাকে ভোগ নিবেদন করবেন না।

অনুরোধ নয়—আদেশ। চমকে উঠলেন প্রধান পুরোহিত। ফিরে দেখতে পেলেন নাটোর রাজসরকারের কর্মচারী দুজনকে। প্রশ্ন করলেন, কেন, মাকে ভোগ নিবেদন করবো না কেন?

রানীমার আদেশ। বললেন একজন কর্মচারী। আজ থেকে মায়ের ভোগের আগে ক্ষেপা বাবার ভোগ হবে।

ম্লেচ্ছ পাগলটার ভোগ! চমকে উঠলেন পুরোহিত। বললেন, অসম্ভব। প্রাণ থাকতে এ অনাচার আমি হতে দেব না।

রানীমার আদেশ আপনাকে জানালাম। এই মুহূর্তে আপনি মন্দির থেকে বেরিয়ে আসুন। মহারাজের আদেশে আপনার চাকরি শেষ। কাছারীতে গিয়ে আপনি আপনার মাইনা নিয়ে সূর্যাস্তের আগে তারা-পীঠ ছেড়ে চলে যান।

মহারাজের আদেশ জানিয়ে কর্মচারী দুজন ছুটলেন মহাশ্মশানের দিকে।

শ্মশানের অভ্যন্তরে পাগল ছেলে তখন আপন ভাবে বিভোর। সঙ্গী দল ঘিরে বসে আছে তাকে। অনাহারে চারদিন কেটেছে। আজ পাঁচদিন। অভিমান মায়ের ওপর। খেতে বলে, মার খাওয়ানো। ঠিক আছে খাবার জন্যে যখন মার খাইয়েছো, আর খাদ্য তুলবো না মুখে। চারদিন এক বিন্দু জল গ্রহণ করেনি। কিন্তু বড় জ্বালা ওই ওদের নিয়ে, ওই কালুর দল। আচ্ছা, আমি খাইনি খাইনি, তোরা খাবি না কেন? যা-না বাবা একটা শব তুলে নিয়ে ভাগাভাগি করে খেয়ে আয়। আমার জন্যে মিথ্যে-মিথ্যে তোরা কষ্ট পাচ্ছিস কেন?

আমি খাব না বেশ করবো। মা মার খাওয়ালে কেন? পাছে

কেউ এসে খাওয়ায় সেই জন্যে লুকিয়ে বসে আছে নির্জন জায়গায়। সময়-অসময়ের সঙ্গীরা খুঁজেছে অনেক কিন্তু সন্ধান পায়নি। যে ধরা দিতে চায় না, তাকে ধরে কার সাধ্য।

হঠাৎ দূর থেকে গলা পেলেন মানুষের। কারা যেন আসছে এদিকে। একবার ভাবলেন লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু না, বসে রইলেন চুপ করে। কালুর দল গোঁ-গোঁ শব্দ করতে করতে ঘিরে বসল তাঁকে।

বিশাল পুরুষ। নগ্ন ধূলি ধূসরিত। কালো গাত্রবর্ণ। আয়ত চক্ষুদ্বয়। মাথায় রুক্ষ চুল। সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত। চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে ক্ষতে। গলায় মহাশঙ্খের মালা।

দেখে চমকিত হলেন নাটোরের কর্মচারী দুজন। দীর্ঘদিন তাঁরা রাজ সরকারে চাকরি করছেন। জীবনে অভিজ্ঞতা বড় কম নয় তাঁদের। বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। দেখলেন একজন মানুষকে! কয়েক ঘণ্টা হল তাঁরা এখানে এসেছেন। শুনেছেন বদ্ধ পাগল, ক্ষেপা। কিন্তু এই কি পাগলের লক্ষণ? এ যে যোগী পুরুষ। সাক্ষাৎ ভৈরব।

বললেন, বাবা, আমরা নাটোর থেকে রানীমার আদেশে আপনার কাছে এসেছি।

নির্বিকার পাগল ছেলে। মুখে কোন কথা নেই, নেই কৌতূহল।

বিনীত ভাবে হাত জোড় করে তাঁরা বললেন, বাবা, আজ মায়ের ভোগ এখনও হয়নি। আপনি দয়া করে একবার মন্দিরে চলুন বাবা।

মন্দিরে! চঞ্চল হল পাগল ছেলে। বলল, না-না, মন্দিরে আমি আর যাব না। মন্দিরে গেলে ওরা মারবে বলেছে। আমার শ্মশান-ই ভাল।

না বাবা কেউ আর আপনাকে মারবে না। যারা আপনাকে মেরেছিল রানীমার আদেশে চাকরি গেছে তাদের।

চাকরি গেছে। কেন গো, তাদের চাকরি গেল কেন। না, না,

এ ভাল নয়। এবাজারে ওদের চাকরি গেলে ওদের বউ ছেলে না খেয়ে মরবে যে গো।

ওসব জানি না বাবা। রানীমার আদেশ। আপনাকে যারা মেরেছে তারা যেন এ গ্রামে আর না থাকে।

ককিয়ে ওঠে পাগল ছেলে, এসব কি বলতো? আমাকে মেরেছে বলে কাজ গেল ওদের। ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায়—কি অন্যায়। আমাকে মেরেছে বেশ করেছে। ওদের তো কোন দোষ নেই। আমাকে মার খাইয়েছে তো তারা মা। তোমাদের রানীমাকে গিয়ে বোল ওদের যেন চাকরি থাকে।

মুগ্ধ বিস্মিত নাটোর সরকারের কর্মচারী দুজন। একি শুনছেন তাঁরা। যাদের হাতে লাঞ্ছিত অপমানিত হলেন, তাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদে! বলছেন, ওদের কোন দোষ নেই! তাঁরা বললেন, বাবা, রানীমার অনুরোধ আজ থেকে আপনি তারা মার মন্দিরের সমস্ত ভার নিন।

আমি! বিস্ময় ফুটে উঠল পাগল ছেলের চোখে মুখে। বললেন, সেকি কথা বাবা। আমি কি ভার নেব? আমি যে কিছুই জানি না।

কিছুই জানতে হবে না বাবা। আমরা এখানে থাকবো। আমরাই সব দেখাশোনা করবো।

তা বেশ তা বেশ। হাসলেন পাগল ছেলে। তোমরাই তারা মাকে দেখ।

আর রানীমার আদেশ আজ থেকে মায়ের ভোগের আগে আপনার ভোগ হবে।

সেকি গো! চমকে উঠল পাগল ছেলে। একি হুকুম তোমাদের রানীমার? মা খাবে না আমি খাব? তা কি হয় নাকি? না বাবা ও সবের মধ্যে নেই। আবার কি ঝামেলা হবে, কাজ কি? অভিমানে ঠোঁট ফোলে। আমার দরকার নেই মন্দিরে যাবার। এখানে বেশ আছি আমি।

কর্মচারী দুজন রানীমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলেন। শুনে পাগল ছেলের দুচোখ ছলছল করে ওঠে। মুছে যায় মার প্রতি অভিমান।

নাটোরের রানীমার ব্যবস্থা কাজে পরিণত হল। সে ব্যবস্থা আজও বিদ্যমান। আজও মা তারার ভোগের আগে তাঁর সন্তানের ভোগ হয়। আগে সন্তান খায় তারপর মা। এতো সংসারের নিয়ম। ছেলেকে খাইয়ে মা খায়।

দেশে আজ লক্ষ লক্ষ নিরন্ন সন্তান। পেটে ভাত নেই, মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই, নেই শিক্ষা-স্বাস্থ্য। মন্দিরে মন্দিরে বিরাজ করছেন দেব দেবীর দল। চলছে পূজা অর্চনার ধূম—ভোগরাগ। কি বিশাল আয়োজন। দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করার কি অক্লান্ত প্রয়াস। মাগো গ্রহণ করো মা। তুষ্ট হও।

সেই সঙ্গে পাপী-তাপীকে উদ্ধারের জন্যে দিকে দিকে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ধর্মগুরুর দল। লক্ষ লক্ষ শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে ফলাও ব্যবসা। ধর্মের ব্যবসায় কোন মূলধন লাগে না। সেই ব্যবসায় মেতেছেন তাঁরা। মূঢ় অজ্ঞের মনে চৈতন্য জাগাচ্ছেন। বিলাচ্ছেন নাম। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক পিতা-সন্তানের কিন্তু পিতাকে স্পর্শ করে প্রণাম করা চলবে না। তুমি ব্রাহ্মণ ওদিকে বসো—শূদ্রের দল এদিকে। মানবতাকে করছেন অপমানিত লাঞ্ছিত। তবু মানুষ ছুটে চলেছে। ধর্মগুরুর দলও করে চলেছেন ব্যবসায়। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। গুরুদর্শনে শিষ্য চলেছে উপাদেয় জিনিস নিয়ে। সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি গ্রহণ করেন করুণা করে জীবন ধন্য হবে, কিন্তু শিষ্যের অর্ধাহারে দিন কাটে। গুরু ভুলেও জানতে চান না, সন্তান তাঁর দুবেলা পেটভরে খেতে পায় কিনা।

সুধাতীর্থের পাগল ছেলের জন্যে একদিন মার প্রাণ কেঁদেছিল। আজও মায়ের প্রাণ কাঁদে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন সন্তানের জন্যে। সন্তানের দল ছুটে যায় মার কাছে। কাঁদে মা-মা বলে। মাও কাঁদেন সন্তানের দুঃখে—বেদনায়। তাই কখনো মার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল,

কখনো বা বেদনায় বিষাদ মলিন। মা কখনো শান্ত—কখনো ভয়ঙ্করী।

কারো কারো ধারণা তারাপীঠে এসে মদ না খেলে তারাপীঠ আসাই ব্যর্থ। বামাক্ষেপা মদ খেত আমরা খাব না কেন? মদ গাঁজা যা ইচ্ছে খাও, ডাক তারা তারা বলে। ডাকতো বামাক্ষেপা। মদ খেয়ে দিন রাত তারা তারা বলে চিৎকার করতো। তাহলে? ।

কেউ বলে তারাপীঠের পাণ্ডার দল বড় বদ। বড়লোভ পাণ্ডার দলের। তাই কি? সমস্ত ভারতবর্ষের কোন্ তীর্থের পাণ্ডারা অল্পে সন্তুষ্ট? অধম কিছু কিছু ঘুরেছে। পাণ্ডার জুলুম নেই এমন তীর্থ খুবই কম আছে গোটা ভারতবর্ষে। তারাপীঠ তো দীন দরিদ্র—ধনী নির্ধন সকলের আপন ঘর।

সেদিন দীন দরিদ্র আতুরের দল প্রসাদ পেত মায়ের। নাটোরের রানীমার ইচ্ছে মায়ের পূজা করেন ক্ষেপা বাবা। রাজসরকার থেকে একদিন বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফুল মিষ্টি ভোগ ইত্যাদির বিরাট আয়োজন। নতুন পুরোহিত পুজোর আয়োজন শেষ করে শ্মাশানে ছুটলেন পাগল ছেলের খোঁজে।

খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। নতুন পুরোহিত দেখতে পেলেন পাগল ছেলে বসে আছে একজায়গায়। সঙ্গীর দল ছুটো-ছুটি করে খেলা করছে। একদৃষ্টে খেলা দেখছে পাগল ছেলে। চোখে মুগ্ধতা, মুখে হাসি। সরল শিশুর প্রতিমূর্তি। কখনো উৎসাহ দিচ্ছে কারো নাম ধরে, আবার কেউ গায়ে পড়লে তাকে বকছে। শ্বেত-ফুলির একবার কান মুলে দিয়ে বলল, হতচ্ছাড়ি।

নতুন পুরোহিত কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, বাবা, আসুন।

কোথায় গো বাবা! উৎসুক নেত্রে জানতে চাইল ছেলে।

আজ আপনার পুজো করার কথা। রানীমা পুজো দেখবেন আপনার।

চলুন বাবা। উঠে দাঁড়াল পাগল ছেলে। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, ওরে তোরা খেলা থামা। আমি বড়মার পুজো করতে চললুম। যদি যাস তো আয় তোরা।

দিগম্বর পুরুষ শ্মশান থেকে চলেছে মন্দিরের দিকে। সঙ্গে চলেছে একপাল কুকুর। পাশে পাশে কালু। মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ছে। পথ করে দিচ্ছে। অদ্ভুত দৃশ্য।

মন্দিরের নহবতখানায় বাজছে ঢাক ঢোল সানাই মৃদঙ্গ। মন্দির আজ মানুষের মেলায় ভরে গেছে। নাটোর থেকে যেমন অনেক মানুষ এসেছেন, তেমনি এসেছেন গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা।

পূজারী পাগল ছেলের হাত ধ'রে মন্দিরে মায়ের সামনে নিয়ে [illegible]লেন।

ও বাবা, একি গো, আজ যে অনেক আয়োজন। হাসছে পাগল ছেলে। দেখছে সব কিছু আর খুশি ঝরে পড়ছে চোখে মুখে। বাঃ বাঃ, বেটির আজ খুব মজা। খুব পেটে ঠুসে খাবে।

পুরোহিত বললেন, বাবা পুজোয় বসুন।

বসবো—বসবো। হাসছে পাগল ছেলে। দাঁড়াও না গো, আগে ভাল করে দেখি সব। বাঃ, নতুন বেনারসী পরেছে বেটি। খুব মজা।

আসনে বসে পড়ল পাগল ছেলে। পুরোহিত জল ইত্যাদি এগিয়ে দিতে গেল। কিন্তু কি হবে জলে। ততক্ষণে পায়সের হাঁড়ি টেনে নিয়েছে ছেলে। মুখে পুরছে তো পুরছে। আনন্দে চোখ বোজা।

খাওয়া শেষ। উঠে দাঁড়াল ছেলে। বলল, কই গো কালাচাঁদ কাকা, পাঁঠা বলি দাও না, আর দেরি করছো কেন?

দর্শনার্থীর দল অবাক। একি পুজোরে বাবা। মায়ের পুজোর আগে নিজে খেলেন। এবার পাঁঠাবলির জন্যে ডাকছে।

ঘাতকের খাঁড়া নিয়ে ছুটো। ফুল ফেলে দিয়ে পাগল ছেলে বলল, এই কালাচাঁদ কাকায় ফট্. যাও দেরি কোর না, তাড়াতাড়ি বলিটা শেষ করে ফেল।

যেমন হুকুম তেমনি কাজ। পাঁঠা বলি হল।

দর্শনার্থী কে যেন চুপি চুপি পুরোহিতকে বলল, ঠাকুর মশাই, একি পুজো?

হাসিমুখে নিম্নস্বরে পুরোহিত বললেন, বাবার সবই উল্টো। পুজোর আগেই পাঁঠা বলি আর ভোগ গ্রহণ।

দর্শনার্থী আর পুরোহিতের কথা ঠিক কানে গেছে। হাসি মুখে বলল পাগল ছেলে, হ্যাঁরে শালারা হ্যাঁ, তো শালারা কি জানবি?

বলি শেষ। চলে যাচ্ছে পাগল ছেলে।

পুরোহিত বললেন, বাবা মায়ের পুজো করলেন না?

ওটা তুমিই ভাল করে করে দাওনা বাবা।

কিন্তু বাবা আপনার পুজো দেখবার জন্যেই যে সকলে এসেছেন

আমার পুজো! ক্ষণিক ভাবলো পাগল ছেলে। উঠে দাঁড়িয়েছিল চলে আসার জন্যে। আবার বসে পড়লো। বিড়বিড় করে বলল, আমি খেয়েছি, বেলা হয়েছে—এবার তুই খেয়েনে মা। না খাবিতো তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব—বুঝলি!

আবার উঠে দাঁড়াল পাগল ছেলে। আর নয় এবার যেতে হবে।

নতুন পুরোহিত বললেন, বাবা, মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন না?

সেটা কি গো? আমার আর ভাল লাগছে বাবা। মাকে বল বাবা, ওটা মা নিজেই নিয়ে নেবে।

অপরাধ নেবেন না বাবা, বললেন নতুন পুরোহিত। দয়া করে পুষ্পাঞ্জলিটা মাকে দিয়ে যান।

আচ্ছা ঝামেলা তো বটে। আরক্ত চোখে নতুন পুরোহিতের দিকে তাকাল পাগল ছেলে। পুষ্পাঞ্জলি না দিলে বুঝি রাক্ষসীর মন ভরে না?

বাবা আপনি তো সবই জানেন। কাকুতি করলেন নতুন পুরোহিত।

দূর শাল, আমি কি জানি। আমি খাই দাই ডুগডুগি বাজাই। দুহাতে চন্দনচর্চিত রক্তজবা আর পদ্মফুল নিয়ে তারা মার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে শুরু করল পাগল ছেলে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, ডুকরে কাঁদছে শিশু, কাঁদতে কাঁদতে মায়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এই নে ফুল, এই নে বেলপাতা। পুষ্পাঞ্জলি নেয়ার বড় শখ— নে, নে, ফুল নে ফুল।

দেখতে দেখতে গালাগালি মন্ত্রে অর্পিত পুষ্পাঞ্জলি মায়ের বুকে মালাকারে সজ্জিত হল। সেই সঙ্গে সমাধি হল পাগল ছেলের। পুরোহিত চিৎকার করে উঠল, বাবা-বাবা বলে। গায়ে হাত দিলো। ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের সন্তান মায়ের কোলে। পরদিন ভাঙ্গলো পাগল ছেলের সমাধি।

এ পুজো সাধারণের চক্ষে অনাচার। পুজোয় মন্ত্র নেই, কিছু নেই, এ কেমন পুজো। সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। অভিযোগ যায় নাটোরের রানীমার কাছে। পণ্ডিতের দল তাঁর কাছে ছুটে পর্যন্ত যান। চিকের আড়াল থেকে রানীমা শোনেন অভিযোগ।

পণ্ডিতরা আবেদন করেন, মা আপনি ক্ষেপার ওই অনাচার বন্ধ করুন মা।

রানীমা মৃদু কণ্ঠে জানতে চান, কিসের অনাচারের কথা বলছেন আপনারা পণ্ডিত মশাই?

ও পাগল মায়ের পুজোর বিধিবিধান কিছুই জানে না, কিছুই মানে না মা। নিজের খেয়াল খুশিতে চলে। শুদ্ধাচারের কোন বালাই নেই। এতে মা যে রুষ্টা হচ্ছেন মা।

রানীমা ধীর কণ্ঠে বলেন, পণ্ডিত মশাই, আপনাদের কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু মা রুষ্টা হচ্ছেন এটা কি করে মেনে নিই বলুন তো?

নিশ্চয়ই রুষ্টা হচ্ছেন মা। বলেন পণ্ডিতের দল। অর্ধেক দিনই ক্ষেপা মায়ের ভোগ খেয়ে নিচ্ছে। মা থাকছেন উপোসী।

কিন্তু পণ্ডিত মশাই, সন্তানের খাওয়া হলে তবেই তো মা খায়।

ব্যর্থ এবং বিরক্ত হন পণ্ডিতের দল। বলেন, মা, এটা আপনি ঠিক করছেন না মা।

আপনারা রুষ্ট হবেন না পণ্ডিত মশাই। আমি তো কিছুই করছি না। আমার করার কিছু নেই। মায়ের যা ইচ্ছা মা তাই করাচ্ছেন।

কিন্তু মা মন্দির তো আপনার।

মন্দির নাটোর রাজসরকারের কিন্তু তারা মা যে সকলের। মা যে বিশ্বমাতা। সকল সন্তানের জননী।

পণ্ডিতের দল রুষ্ট, ক্ষুব্ধ হন। বুঝতে পারেন তাঁদের যুক্তিতে কোন কাজ হবে না। শাস্ত্রের দোহাই শুনবেন না। রাজার কাছে গেলে বলেন, আমি বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত—রানীই ওসব ব্যাপার দেখেন। রানীমার গলায় ভিন্ন সুর। তারাপীঠের ক্ষেপার প্রতি অন্ধত্ব। কিন্তু কিসের অন্ধত্ব—কিসের পক্ষপাতিত্ব। কি আছে ওই ক্ষেপার মধ্যে? দিন রাত্রি মদ গাঁজায় চুর। একপাল কুকুর নিয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায় আর তারা-তারা বলে চিৎকার করে। উদোম ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, নারী পুরুষে ভেদ নেই। এই যদি সাধক হয়, তাহলে বেদপুরাণে পারদর্শী হয়ে সমস্ত জীবন জপতপস্যা করলেন যাঁরা তাঁরা কি?

শাস্ত্রের কি বোঝে ওই পাগল, জানেই বা কি? নিজেই তো বলে, আমি বাবা কিছু বুঝি না, কিছু জানি না। যা জানার জানে তারা মা।

রাজকুমারী কখনো কখনো ছেলেকে দেখতে আসেন রামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি সব সময় খবর রাখেন তাঁর পাগল ছেলের। বলেন অভিমানরুদ্ধ গলায়, হ্যাঁ বামা, তুই আমাকে ভুলে গেলি বাবা?

ভুলে গেছি। গর্ভধারিণীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাসে ছেলে,

তুমি কি গো মা, তোমাকে কি ভোলা যায়। সন্তান কি মাকে ভুলতে পারে নাকি গো?

ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন রাজকুমারী। কত রোগা হয়ে গেছে। বলেন খুব রোগা হয়ে গেছিস বাবা।

উত্তর দেয় না ছেলে। হাসে। মায়ের বুকে মুখ রাখে।

বিরোধীতার ঝড় বয় তারাপীঠ জুড়ে। একদল সক্রিয় হয়ে ওঠে সমালোচনায়। পাগল ছেলে নির্বিকার। নিজের ভাবে বিভোর। মুখে হাসি। গলায় গান। তারা-তারা বলে কাঁপায় আকাশ বাতাস।

নিজের খেয়াল খুশি মত কোন দিন মন্দিরে আসে—কোন দিন আসে না। দুটো ফুল ছুঁড়ে দেয়। কোন দিন নিজে খেয়ে নিয়ে যেমন হঠাৎ মন্দিরে এসেছিল তেমনি হঠাৎই চলে যায় শ্মশানে।

হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হল, শিলামূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করল। দেবীর পবিত্র অঙ্গ মূত্রস্পর্শে অপবিত্র হচ্ছে দেখে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন পুরোহিত, ছিঃ ছিঃ বাবা একি করলেন, একি করলেন আপনি!

কথা শুনে অবাক ছেলে, জানতে চায়, কি করলুম বাবা?

মাকে অপবিত্র করে দিলেন।

অপবিত্র করে দিলুম। কেন বাবা?

আপনার মূত্র স্পর্শে মা যে অপবিত্র হয়ে গেল।

অপবিত্র হয়ে গেল? কথাটা শুনেই ছেলের রুদ্র মূর্তি, বেশ করেছি, আমি আমার মায়ের গায়ে মুতেছি, তোর কিরে শাল? আমি কি তোর গায় মুতেছি, আমি আমার মায়ের গায়ে মুতেছি—মুত পেলে আবার মুতবো।

বলতে বলতে রাগ করে ছেলে চলে গেল শ্মশানে।

পুরোহিতও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সহকারীর হাতে মায়ের পুজোর দায়িত্ব দিয়ে নাটোর ছুটলেন। রাজাকে বললেন সব কথা। রাজা বললেন রানীকে। জানতে চাইলেন, কি করা যায়?

রানী বললেন, আপনি য ভাল বোঝেন তাই করুন।

রাজা মাকে শুদ্ধ করার জন্যে কাশী থেকে গাঁজেন সুপণ্ডিত আনার ব্যবস্থা করলেন। একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী কাশী যাত্রা করলেন। কিন্তু পণ্ডিতরা এসে পৌঁছবার আগেই রাজা স্বপ্ন দেখলেন। ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর। তিনি ভাবতে লাগলেন, স্বপ্ন না সত্য! কানে বাজছে জগন্মাতার কথাগুলো, যদি তুই আমাকে শুদ্ধ করিস, তাহলে আমি তারাপীঠ ছেড়ে চলে যাব। সন্তান চিরকালই মায়ের কোলে মল-মূত্র ত্যাগ করে, তাতে কি মা কখনো অপবিত্র হয়?

কাঁদছে পাগল ছেলে। কাঁদছে ফুলে ফুলে। যে দেখে সে-ই অবাক হয়। একি ব্যাপার! কাঁদে কেন? কি হয়েছে? মা নেই। রাজকুমারী দেহ রেখেছেন দিন তিনেক হল। তিন দিন হল সমানে কেঁদে চলেছে পাগল ছেলে। তিনটে দিন দাঁতে কুটো কাটেনি। শুধু কান্না আর কান্না। সঙ্গীর দল নীরবে বসে আছে তাকে ঘিরে। তারাও অভুক্ত।

রামচন্দ্র সুরেন সরকারের সঙ্গে এসে দাঁড়াল দাদার সামনে। দুই ভাই গলা জড়াজড়ি করে আবার কাঁদে। বড় ভাই ছোটভাইকে সান্ত্বনা দেয়, কাঁদিসনি রামু, কেঁদে কি করবি বল। মা বাপ তো চির-কাল কারো থাকে না রে। এক মা গেল, রইলো জগন্মাতা। বলে আর কাঁদে। দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট ভাইকে।

সুরেন সরকার বলেন, বামা, মায়ের কাজ তো করতে হবে বাবা। কি করা হবে তার কিছু বল?

আমি! আমি কি জানিগো কাকা। বল আমাকে কি করতে হবে। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। আমার মায়ের জন্যে আমি সব করতে পারি। আমার জন্যে মা আমার কত কষ্ট পেয়েছে বলতো? কত কাঁদিয়েছি আমি মাকে। সেই মা আমার বড়মার

কাছে চলে গেছে। বল কাকা আমি কি করবো? করুণ আকুতি ফুটে ওঠে ছেলের মুখে।

পিতৃবন্ধু সুরেন সরকার। বিপদে আপদে—সময়ে অসময়ে সর্বানন্দের পরিবারকে সাধ্যমত রক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। বলেছিলেন, রামু মায়ের শ্রাদ্ধ করবে। তোকে তো বাড়ি যেতে হবে বাবা

যাব। এক কথায় রাজি ছেলে। কবে যেতে হবে কাকা?

দিন বলেন সুরেন সরকার। যাবার সময় বার বার বলেন, বামা যাস বাবা, ভুলে যাসনি যেন।

ভুলে যাব কিগো কাকা। আমার মায়ের কাজ ভুলে গেলে কি চলে। তুমি কিচ্ছু ভেব না আমি ঠিক যাব।

সুরেন সরকার রামুকে নিয়ে আটলায় ফিরে যান। বন্ধু সর্বানন্দের স্ত্রীর শ্রাদ্ধের দায় দায়িত্ব প্রায় তিনিই বহন করছেন। এমন কোন সঙ্গতি নেই যে রামু মাতৃদায় থেকে উদ্ধার পায়। জমি জায়গা যা ছিল এখন প্রায় নেই বললেই চলে, ভরসা শুধু ভিটেমাটিটুকু। তিনি ঠিক করেছেন শ্রাদ্ধের কাজ শেষ করে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে কাজ সারবেন। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন দুপুর হওয়ার আগেই ব্যাপার দেখে সকলের চক্ষুস্থির। একের পর এক লোক আসছে। মানুষের মিছিল যেন। সাত গ্রামের লোক আসছে আটলায়। কি ব্যাপার, তোমরা কেন গো? জানতে চাইলেন সুরেন সরকার।

আমাদের নেমন্তন্ন। সকলের মুখে এক কথা।

কে নেমন্তন্ন করেছে তোমাদের?

কেন ক্ষেপা, আমাদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এসেছে। মায়ের শ্রাদ্ধে যেও তোমরা। না গেলে দুঃখ পাব। সেইজন্যেই এসেছি আমরা।

এযে বিনা মেঘে বজ্রপাত। সুরেন সরকার কিছু ভাবতে পারছেন না। এত মানুষের খাওয়াতো দূরের কথা, বাসন কোথায়? এযে

সত্য সত্যিই পাগলের কাণ্ড। হাত জোড় করলেন তিনি সকলের কাছে। বোঝালেন অনেক। বিনীতভাবে সকলকে ফিরে যাবার অনুরোধ করলেন। পাঁচ জনের সাহায্যে রামু শুদ্ধ হয়েছে। এত মানুষকে সে কি করে খাওয়াবে। সাধ্য কোথায় তার?

কথা শুনে ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা, উত্তেজিত হয়ে উঠল মানুষ। কি আমরা কি বিনা নেমন্তন্নে এসেছি। ডেকে এনে এখন অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুরু হয়ে গেল গোল-মাল।

তার মধ্যেই চিৎকার, ওই আসছে, ওই আসছে।

আসছে ক্ষেপা। আজ ওর একদিন কি আমাদের একদিন। অপমান করা শোধ আমরা তুলে ছাড়বো।

আসছে দিগম্বর ভোলানাথ। হাতে কঞ্চির লাঠি। ঢুলু-ঢুলু চোখ। মুখে হাসি। আসছে হেলতে দুলতে।

ভিড় ঠেলে সুরেন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন পাগল ছেলের দিকে, বাবা বাবা, একি সর্বনাশ তুই করেছিস দেখতো বাবা!

হাসছে ছেলে। যেন কিছুই জানে না। অবাক গলায় জানতে চায়, কি করলুম গো কাকা, কিসের সর্বনাশ। বার বার করে আসতে বলেছিলে, দেখ ঠিক চলে এসেছি।

কিন্তু বাবা ওই ওরা। হাজার খানেক লোককে দেখান সুরেন সরকার। ওরা বলছে তুই নাকি ওদের নেমন্তন্ন করেছিস?

করেছিই তো। হাসে পাগল ছেলে। আমার মায়ের শ্রাদ্ধ। আমার মায়ের শ্রাদ্ধে দরিদ্র নারায়ণ যদি সেবা না করে আমার মায়ের আত্মা শান্তি পাবে না যে কাকা। সেই জন্যেই তো আমি সাত গাঁয়ের মানুষকে বলে এসেছি।

কিন্তু বাবা, ওরা খাবে কি? পাড়ার পাঁচ জনে মিলে সাহায্য করেছে বলেই রামু উদ্ধার হল। এখন এত লোকের খাবার যোগাড় কি করে করি বলতো বাবা?

ওসব ঠিক হয়ে যাবে কাকা। তারামা সব ব্যবস্থা করেছে। তোমরা ওদের সব বসাও না। রামু কোথায়, রামু?

ঘরের মধ্যে ভয়ে লুকিয়ে বসে থাকা রামু বেরিয়ে আসে। পাড়ার পাঁচ জনে বসায় হাজার মানুষকে। সার দিয়ে আসছে মানুষ। কারা আসছে মানুষ না অন্য কিছু? কারো কাঁধে লুচির ঝোড়া, দই, সন্দেশ মণ্ডা মেঠাই। কোথা থেকে আসছে ওরা? প্রয়োজন কি প্রশ্নে? বসে পড়ো, খাও। দিগম্বর ভোলার কণ্ঠে তারা-তারা রব।

খাচ্ছে মানুষ। ছাঁদা বাঁধছে। হঠাৎ আকাশ কালো করে এলো। ঝড় উঠবে—বৃষ্টি।

হায় হায় করে উঠল মানুষ, সব বুঝি পণ্ড হল।

আকাশের নিবিড় মেঘের দিকে চেয়ে গর্জে উঠল পাগল ছেলে, কি? স্বয়ং তারামা যার মায়ের শ্রাদ্ধে উপস্থিত, তার আয়োজন পণ্ড হবে। তো শালারা কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে খা, তোদের কোন ভয় নেই—এই আমি গণ্ডী দিয়ে দিচ্ছি, তোদের গায়ে এক ফোঁটা জলও পড়বে না।

মানুষের মন সন্দেহে ভরা। বলল, যদি জল পড়ে?

জল পড়বে না গো, নিশ্চিন্ত হও তোমরা। তারামা যেখানে উপস্থিত সেখানে কি বাধা আসতে পারে। সব বাধা তিনিই দূর করে দেবেন।

তারা মা কয় গো?

ওই তো তারামা। আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। সর্বত্রই তিনি বিরাজ করছেন।

ওসব তোমার মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা? ছল ছল করে উঠল পাগল ছেলের দুই চোখ, মিথ্যে আমি বলিনি ভাই। মা আমাকে যা বলান, আমি তাই বলি। মিথ্যে যদি বলি তা মা-ই বলান।

ধন্য সাধক, ধন্য তোমার মাতৃভক্তি, ধন্য তোমার সাধনা। আকাশ

ভেঙ্গে দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল। খাল বিল নদী নালা দেখতে দেখতে ভরে গেল বৃষ্টির জলে। গণ্ডীর বাইরে প্রশস্ত মাঠ জলে ভেসে গেল, কিন্তু গণ্ডীর মধ্যে এক ফোঁটাও জল পড়লো না বা বাইরের জল ভেতরে এল না।

অবিশ্বাসীর দল চুপ। বিশ্বাসীর দল মুখর। সবচেয়ে আনন্দ সর্বেশ্বরের। হাসি কান্নায় দুলে দুলে-ফুলে ফুলে ওঠে তার সারা দেহ মন। মানুষ দেখুক, জানুক তার পাগলভাই, যারা তাকে ক্ষেপা বলে অবজ্ঞা করে সে কত বড়—কত বিরাট!

মৃগনাভির গন্ধে মোহিত হয়ে যেমন মৃগের পিছু পিছু মানুষ ছোটে গভীর অরণ্যে, বারোশো পঁচানব্বই সালের পর থেকে মানুষ ছুটে আসতে শুরু করল তারাপীঠে। বীর সাধকের আহ্বান পৌঁছাল দিকে-দিকে। ভীতিসঙ্কুল শ্মশানে ছুটে আসছে মানুষ। প্রেমের আহ্বান কি উপেক্ষা করা যায়? ডাকছে পাগল ছেলে, ওরে তোরা আয়, তোদের সব দুঃখ কষ্ট, তোদের দৈন্য সব ঘুচে যাবে। তোরা ডাক। মাকে ডাকরে তোরা!

আসছে মানুষ। যত দিন যাচ্ছে মানুষের আসা ততোই বেড়ে চলেছে। বাড়ছে ভক্তের সংখ্যা। মন মেজাজ ভাল থাকলে পাগল ছেলে সদাশিব। কিছু বলার আগেই বলে, কি বাবা, মিথ্যে মিথ্যে মন খারাপ করে আছিস কেন বাবা? মাকে ডাকনা। পাগলী বেটিকে ডেকে ডেকে কান ঝালাপালা করে দে। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক করে দেবে।

ভক্ত বলে, ডাকছি তো বাবা।

ওরে বাবা, ওরকম করে ডাকলে হবে না। দয়া ভিক্ষে করলে হবে না বাবা। সব সময় ডাক। খেতে, শুতে, চলতে, ফিরতে। সব সময়। ওরে মাকে ডাকার কি নিয়ম অনিয়ম আছে, সময় অসময়

আছে। নেই আঁকড়া ছেলের মত ডাক বাবা। দেখি বেটি কেমন চুপটি করে থাকে। যে ছেলে কেঁদে কেটে মাতামাতি করে মা তো তাকেই আগে শান্ত করে রে। ভাল ছেলে হয়ে, বাধ্য থাকলে কোন্ মা আগে তাকে দেখে বলতো? দুষ্টু ছেলেটাকেই তো মা আগে শান্ত করে রে।

কোন ভক্ত বলে. বাবা, মায়ের কাছে চাইতে হবে কেন? মা তো সবই বুঝতে পারছেন, সবই দেখতে পাচ্ছেন।

হাসে পাগল ছেলে। বলে, চাইবি না কেন বাবা। মায়ের কাছে চাইতে লজ্জা কি? মায়ের কাছে চাইবি না চাইবি কার কাছে। ওরে মা তোদের রাজরাজেশ্বরী। সেই মায়ের সন্তান তোরা। নিজেকে ছোট ভাবিস কেন বাবা। বড় ভাবলে হয়তো বড় হওয়া যায় না, কিন্তু নিজেকে ছোট ভাবতে ভাবতে মনটা যে ছোট হয়ে যায় বাবা। সংসারে হিংসে করে লাভ কি বল? সংসারে হিংসে করলেই কি তোর সব হবে? ওরে তোরা মায়ের ওপর নির্ভরশীল হ। মাকে ডাক বাবা।

আসছে মানুষ। বাড়ছে ভক্তের সংখ্যা। নানা জনের নানা আবদার। পাগল ছেলে কখনো হাসে, কাউকে সান্ত্বনা দেয়, আবার কারো কথা শুনে রেগে ওঠে। কখনো শান্ত, কখনো উগ্র, আবার কখনো মৌন। হাজার কান্নাকাটিতেও মুখ খোলে না।

এক ভক্তের আবদার, বাবা আমাকে আপনি মন্ত্র দিন।

কথা শুনে হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয় পাগল ছেলে। বলে, সে আবার কি বাবা? মন্ত্র তো রয়েছে বাবা।

ভক্ত নাছোড়। বলে, আমাকে মন্ত্র দিতেই হবে বাবা। না দিলে আমি আপনাকে ছাড়ছি না।

এবার হাসে পাগল ছেলে। বলে, মন্ত্র নিয়ে কি করবি বাবা, সন্নেসী হবি?

ভক্ত চুপ।

কি বাবা চুপ করে রইলি কেন? কিসের মন্ত্র বাবা? কি মন্ত্র?

মন তো তোর। সেই মন দিয়ে মাকে ডাক বাবা। সৎভাবে জীবন কাটা। কাউকে হিংসে করিসনি। দুঃখ-সুখ দুটোকেই সমান ভাবে মেনে নে। মানুষের দুঃখ বেদনার অংশভাগী হ। দেখবি আর কিছুরই দরকার হবে না। ওরে শুধু নিজে খাব নিজে পরবো, আত্ম-সুখের মনোবৃত্তি ছাড়তে হবে বাবা বাবা, আমি তো শুধু আমি নই—সকলকে নিয়েই তো আমি। লীলাময়ী মা যদি জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকে, যদি সন্তানের দল মা-মা বলে না ডাকে তাহলে কোথায় মায়ের মহিমা! সেইজন্যেই তো বলে বাবা ভক্তের দাস ভগবান।

মানুষের দুঃখ সুখে তারা মায়ের পাগল ছেলে হাসে কাঁদে। প্রচার করে মায়ের লীলা। বলে, আমি কেউ নই—কিছু নই, সব ওই বেটি। আমি ও বেটির হাতের খেলার পুতুল মাত্র। মা যা করান আমি তাই করি।

ভক্ত কাঁদে। চোখের জলে বুক ভেসে যায়। বলে, বাবা, এ দুঃখ আর সহ্য করতে পারছি না। সাত সাতটা ছেলে হল একটাও বাঁচল না। এবার দয়া করে একটা ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দিতেই হবে বাবা।

হাসি মুখে ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে থাকে পাগল ছেলে। সৎ-নিষ্ঠাবান ভক্ত। ধনী কিন্তু ধনগর্বে গর্বিত নয়। গরীব দুঃখীর জন্যে অবারিত দ্বার। মানুষের দায় বিপদে সব সময় গিয়ে দাঁড়ায়। হাসতে হাসতে মাথা দোলায় পাগল ছেলে। বলে, হবে-হবে। কিন্তু বাপু তোদের স্বামী-স্ত্রীকে কথা দিতে হবে ছেলেটিকে তোরা আমায় দান করবি।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকায়। একি পরীক্ষা বাবার! সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। ছেলে নিয়ে রাখবেন কোথায়? এ বোধহয় শুধু ছলনা করে দেখছেন তাদের মন। স্বামী বলে, তাই হবে বাবা।

তাই হবে নয় গো, ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে তোমরা দুজনে বল।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই রাজি হয়।

বেশ। জন্মাবার ছ'মাসের মধ্যে তোরা স্বামী-স্ত্রী এসে আমাকে ছেলে দিয়ে যাবি কেমন ?

সে আর এমন কি কথা। আমাদের ছেলে বাঁচবে, বাবা নিজে নেবেন এ তো পরম সৌভাগ্য। ভক্ত বলে, আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমার ছেলেকে নেবেন—আপনার দাস হবে।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুশি মনে বাড়ি ফেরে। ছেলে বাঁচবে একি কম আনন্দের। বাবা যদি সত্যি সত্যিই ছেলেকে রেখে দেয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারাপীঠে থাকবে। ছেলেকে দেখতে পাবে তো।

পাঁচ মাসের শিশুকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী এসেছে তারাপীঠে। শিশু যেন কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। মুখের দিকে তাকালে বুকটা জুড়িয়ে যায়। পাঁচ মাসের শিশু কি দুরন্ত—কি দুরন্ত। মধুর 'মা' বুলি ফুটেছে মুখে। কাঁদতে জানে না—সব সময় মুখে হাসি লেগেই আছে!

স্ত্রী ভাবে, যদি সত্যই বাবা শিশুকে না ফিরিয়ে দেন। যদি থাকতে না দেন তারাপীঠে? তাহলে কি হবে? ছেলে থাকবে শ্মশানে! কত সাপ, ভূত-প্রেত, বিপদ-আপদ—ভাবতেও বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে। কান্না ভেজা চোখে স্ত্রী বলে স্বামীকে, না-না, চলো, ফিরে যাই।

স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। বলে, তা তো হয় না।

স্ত্রী বলে, ছেলে তো আমাদের।

না আমাদের নয়। বাবার কথা অমান্য করতে পারবো না, তাঁর দান তাঁকে দিতেই হবে।

স্ত্রী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি নিষ্ঠুর তাই অমন কথা বলতে পারলে। এ ছেলেকে আমি এক মুহূর্তের জন্যে কোল ছাড়া করতে পারবো না। চলো আমরা পালাই, এদেশ ছেড়ে চলে যাই—বাবা এতদিনে নিশ্চই আমাদের কথা ভুলে গেছেন।

স্ত্রীর কান্না ভেজা মুখের দিকে তাকায় স্বামী। তাকায় সন্তানের

দিকে। একবার মনে হয় স্ত্রীর কথা শোনে। পরক্ষণেই কঠিন করে মন। বাবা কি এতই সহজ, বাবাকে যারা চেনে না তারাই বাবার সম্পর্কে এমন কথা ভাবতে পারে! স্বামী বলে, মিথ্যে কেঁদে মন খারাপ কোর না। ভয় নেই, বাবার দান বাবার কাছে ফেলে দেবো—তারপর তিনি যা করেন!

তাদের দেখতে পেয়েই হাসে পাগল ছেলে, কদিন-ই তোদের কথা ভাবছি। তা কেমন আছিস বাবা?

স্বামী প্রণাম করে। প্রণাম করে স্ত্রী।

হাসি মুখে স্বামী স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে বলে পাগল ছেলে, ছেলে এনেছিস? বাঃ বাঃ বড় সুন্দর দেখতে হয়েছে তো! তা এক কাজ কর বাবা, ওকে ওর মায়ের কোল থেকে নিয়ে শ্মশানের ভেতরে গিয়ে শুইয়ে রেখে আয় কেউ কাছে থাকবি না, যা বললুম এখনি তাই কর।

ডুকরে কেঁদে উঠল স্ত্রী, না আমি আমার ছেলেকে কিছুতেই দেব না। বুকে জড়িয়ে ধরে সন্তানকে।

কিরে, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন,—আমার ছেলে আমাকে দে—এখন যা বলবো তাই করবি না আমাকে করতে হবে?

বাবার কথায় শিউরে উঠল জননী। ভয়ঙ্কর বীভৎস শ্মশান, দিনের বেলা যার ভেতরে যেতে মানুষ ভয় পায়, চারিদিকে ক্ষুধার্ত শিবা মাংসের লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শকুনের দল লুব্ধ চোখে লক্ষ্য করছে নরদেহ, কুকুরের দল সদা সর্বক্ষণ নর-অস্থি নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে যেখানে, সেখানে দুধের শিশুকে কোন্ প্রাণে ফেলে রেখে আসবে! করুণ আর্ত চিৎকারে জননী বলে, না, না, না, আমি ছেলে দেব না, আমার ছেলে—আমি দেব না।

আমার ছেলে! গর্জে ওঠে পাগল ছেলে। কোথায় পেলি ছেলে? কি কথা দিয়ে গিয়েছিলি?

মায়ের মুখে কোন কথা নেই। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে বুক।

শীগ্‌গির আমার ছেলে আমায় দে—যদি ভাল চাস তো, এখনি আমায় দিয়ে দে !

ভক্তটি এতক্ষণে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবার উগ্রমূর্তি দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে স্ত্রীর কোল থেকে জোর করে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে বাবার পায়ের কাছে শুইয়ে দেয়। জননী মূর্ছিতা হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

একজন ভক্তের দিকে চেয়ে আদেশ হয়, ছেলেটাকে শ্মশানের ভেতরে শুইয়ে রেখে আয় তো বাবা।

কিছুক্ষণ পরে মায়ের জ্ঞান ফেরে। ডুকরে কেঁদে ওঠে মা সন্তান হারানোর বেদনায়।

শোন! স্ত্রীকে নিয়ে মন্দিরে যা। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ মন্দির ছেড়ে যাবি না।

কঠোর আদেশ। ক্রন্দনরতা স্ত্রীকে ধরে নিয়ে মন্দিরে যায় ভক্তটি।

সকাল থেকে দুপুর। গোধূলির আলো ফোটে আকাশে। সন্ধ্যা নামে। মন্দিরে বেজে ওঠে কাঁসর ঘণ্টা। শুরু হয় মায়ের সন্ধ্যারতি। সন্তান হারানোর বেদনায় কাঁদছে স্ত্রী। স্বামী পাশে বসে থাকে নীরব পাষাণের মত।

রাত্রি নামে। শীতের রাত্রি। উত্তুরে বাতাস বয় হু-হু করে। সন্তানহারা পাগলিনী মা স্বামীর সব বাধা অগ্রাহ্য করে ছোটে শ্মশানের দিকে। কিন্তু পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ভৈরব। কঠিন কঠোর ভয়ঙ্কর সে মূর্তি। হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে আকাশ বাতাস, খবরদার!

সে নিষেধ অগ্রাহ্য করে সাধ্য কার। সন্তান শোকে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে জননী।

পূবের আকাশে আলোর ইশারা। রাত্রি শেষ হচ্ছে। পাগল ছেলে তারা নামে বিভোর হয়ে গিয়ে ঢোকেন শ্মশানে। ফিরে আসেন শিশুকে কোলে নিয়ে। সঙ্গে সর্বক্ষণের সঙ্গী কালু। সেই পাহারায়

ছিল শিশুর। খেলা করেছে শিশুর সঙ্গে। শিশুকে মায়ের কোলে দিয়ে বলে, এই নে মা, তোর ছেলে। আর কোন ভয় নেই। তারা নাম করতে করতে এবার বাড়ি ফিরে যা।

মায়ের চোখে জল, মুখে হাসি, কিন্তু শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্যে হাত যে এগোয় না।

হাসে পাগল ছেলে, কিরে বেটি কাল থেকে আমার ছেলে আমার ছেলে বলে কত কাঁদলি, এখন নিজের ছেলেকে নিতে এতো সঙ্কোচ কেন রে? যদি বলিস আমার ছেলে, আমি ছেলে নিয়ে করবো কি বল? আমার নিজের থাকার জায়গা নেই তো ছেলে! মাগো ছেলে তোরও নয়, আমারও নয়—জগন্মাতার সন্তান! তুইতো মা জগন্মাতা, সন্তানকে বুকে তুলে নে মা! শুধু দেখিস মা তোর নিরন্ন সন্তানরা যেন কোনদিন বিমুখ হয়ে না ফেরে।

সুধাতীর্থ ঘিরে কত বিচিত্র লীলা। কত আনন্দ, কত বেদনার দিন। বীরাচারী সাধক, ভয় কি জানতো না। ভয় ছিল শুধু পুলিশকে। ছিল পুলিশের প্রতি অবিশ্বাস। বলতো, ওঃ বাবা পুলিশ! না বাবা ওরা লোক ভাল হয় না।

একবার দ্বারভাঙ্গার মহারাজ সিপাহী সান্ত্রী নিয়ে এসেছেন তারা-পীঠ ভৈরবকে দর্শন করতে। মন্দিরে হৈ-চৈ চিৎকার। মানুষের চাপা গুঞ্জন। ভয়ে সারা পাগল ছেলে। যেই শুনেছে মহারাজ আসছে তার কাছে অমনি পালাবার ধান্দা। না বাবা, আমার রাজরাজড়ায় কাজ নেই। আমি বেশ আছি। তোমরা রাজাকে নিষেধ করে দাও না গো।

ভক্তের দল বাবাকে ঘিরে থাকে। ছেড়ে দিলে আর পাওয়া যাবে না। কোথায় চলে যাবে—কে বলতে পারে। হয়তো বা জিবীত কুণ্ডে গিয়ে ডুব দেবে। কখন উঠবে তারামাই জানেন।

রাজার সৈন্যরা এসেছে শ্মশানে। পাগল ছেলে ভয়ে অস্থির। তারা জানিয়ে যায় মহারাজ এখনি আসছেন।

ও বাবা, আমার বড় ভয় করছে, আমি পালিয়ে যাই। ভয়ে ভয়ে বলে পাগল ছেলে।

ভয় কি বাবা। বলে ভক্তরা। মহারাজও তো মানুষ। তিনি আপনাকে খুবই ভক্তি করেন।

তা হোক বাবা, তবু আমার ভয় করছে। আমি মুখ্যু মানুষ। কি বলতে কি বলে ফেলবো।

ভক্তরা মহারাজের সৈন্যদের বলে দেয়, মহারাজ যেন সাধারণ পোশাকে আসেন।

তাই আসেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজ রামেশ্বর সিং। প্রণাম করে হাত জোড় করে বলেন, আপনার কোন ভয় নেই বাবা, আমি আপনার একজন সামান্য ভক্ত। বাবা, আমার অনেক থেকেও কিছু নেই। আমি অপুত্রক। দয়া করে আশীর্বাদ করুন বাবা আপনার আশীর্বাদে বংশ রক্ষার্থে যেন পুত্র-সন্তান পাই।

আমার আশীর্বাদে নয় বাবা, বলুন তারা মার কৃপায়। হাসে পাগল ছেলে। হবে—হবে বাবা, দুঃখ কি, তারা মা বললে একটা নয়, দু-দুটো ছেলে হবে বাবা, নিশ্চয়ই হবে।

পরক্ষণেই পাগল ছেলের উগ্রমূর্তি। মহারাজ বিলিতি মদের বোতল বার করতেই হুঙ্কার, কি তুই আমাকে ঘুষ দিতে এসেছিস? আমাকে মদখোর মাতাল পেয়েছিস শালা? বেরো—বেরো দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

মহারাজ বিস্মিত—হতবুদ্ধি। ক্ষেপা দিন রাত্রি মদ খায়, গাঁজা খায়। তিনি খুশি করার জন্যেই নিয়ে এসেছেন বিলিতি মদ। ফল। সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একাকার। সেই সঙ্গে সমান তালে চিৎকার শুরু করে কালু।

ভক্তের দল সরিয়ে দেন মহারাজকে। নিজের ভুল বুঝতে পারেন.

তিনি। তিনি ভেবেছিলেন বিলিতি মদ খেয়ে খুশি হয়ে বাবা নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন, কিন্তু তাঁর ধারণা যে কত ভুল প্রমাণ পেলেন তার। মনের দুঃখ মনে চেপে দ্বারভাঙ্গায় ফিরে যান তিনি। বার বার মনে পড়ে বাবার আশীর্বাদের কথাগুলো, একটা নয়—দু-দুটো ছেলে হবে তোর। কিন্তু হবে কি? তাঁর ভুলে বিরূপ হয়েছেন সাধক, আর কি তাঁর আশীর্বাদ ফলবে?

কিন্তু কিছু কাল পরেই মহারাজ যমজ পুত্র লাভ করেন। ছুটে আসেন তারাপীঠে। লুটিয়ে পড়েন পাগল ছেলের পায়ে। বলেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন বাবা। দয়া করুন।

হাসে পাগল ছেলে। শিশুর সারল্য ঝরে পড়ে সে হাসিতে। বলে, আবার কি হল বাবা। মা তো ছেলে দিয়েছে। আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

বাবা বিনীত ভাবে বলেন মহারাজ, যদি দয়া করেন, তাহলে সামান্য কটা টাকা প্রতি মাসে আপনার সেবার জন্যে পাঠাবো।

টাকা কি হবে বাবা? টাকায় আমার প্রয়োজনটাই বা কি? কোথায় রাখবো টাকা? হাসে পাগল ছেলে। তারা মায়ের প্রসাদ পাই। কালু আমি খাই দুজনে। টাকা কি কাজে লাগবে বাবা?

না লাগুক। তবু আমি পাঠাবো। ইচ্ছে হলে বিলিয়ে দেবেন। বলেন মহারাজ।

প্রণামী স্বরূপ প্রতি মাসে তিনি চল্লিশ টাকা করে পাঠাতেন। টাকা পাঠাতেন আরো অনেক ভক্ত। আর এই টাকার জন্যই তাঁকে কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। অর্থের কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁর জীবনে কিন্তু অর্থের জন্যে অনর্থ ঘটেছিল।

তারাপীঠের মহাশ্মশানে বামাক্ষেপার অলৌকিক বিভূতির কথা দিন দিন লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে। কিন্তু তারা

মায়ের পাগল ছেলে যে কখন কেমন মেজাজে থাকে, কে বলতে পারে! কখনো উগ্রচণ্ডাল, মানুষ দেখলেই ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারে, মরার হাড় নিয়ে তাড়া করে, অকথ্য গালিগালাজ করে। তারই মধ্যে সাহস করে এসে আছড়ে পড়ে কেউ, বাবা দয়া করুন, বাঁচান।

দয়া করুন, বাঁচান। হুঙ্কার ছাড়ে পাগল ছেলে, পাপ করবি শাল, আর বাঁচাবার বেলায় বাবা।

কাঁদে হতভাগ্য! চোখের জলে বুক ভাসায়, বাবা আপনি ছাড়া যে আর কেউ নেই বাবা। যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি বাবা, আর পারছি না।

মর শাল মর! তোর মরাই ভাল। যা-যা, বেরো, দূর হয়ে যা। মরগে যা।

কাঁদে হতভাগ্য। বলে, বাবা, মরতে দুঃখ নেই। কিন্তু আমি মলে বউ ছেলে মেয়েগুলো যে না খেয়ে মরবে বাবা। আমি মলে ওদের কি হবে, কে দেখবে ওদের?

তার আমি কি জানি। খিঁচিয়ে ওঠে রুদ্র ভৈরব। তোর বউ ছেলেকে খাওয়াবার দায় কি আমার নাকি? পাপ করেছিস, ভুগগে যা —মরগে যা।

বাবা আমি পাপী, মহাপাপী, আর এমন কাজ করবো না।

মনে থাকবে তো?

মনে থাকবে বাবা। কথা দিচ্ছি জীবনে এমন পাপ কাজ আর কোন দিন করবো না।

গম্ভীর হয় সাধক। চোখ বুজে বসে থাকে কিছুক্ষণ। বলে, যা ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু শাল, যে কথা দিলি মনে থাকে যেন। মায়ের নাম করগে যা।

বিচিত্র লীলা। লীলা জগন্মাতার। লীলা করিয়েছেন তাঁর প্রিয় পুত্রকে দিয়ে। কত শত পাপী-তাপীকে উদ্ধার করিয়েছেন। মৃত্যু-পথ যাত্রীকে কাজ শেষ করার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন সংসারে।

কাঁদতে কাঁদতে বাপ-মায়ের সঙ্গে এসেছে মেয়ে। জীবনের শেষ

আশ্রয়স্থল বুঝি চলে গেল। স্বামীর সংসার থেকে বিতাড়িতা হবার সময় আসন্ন। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন কিন্তু স্বামীকে সন্তান দিতে পারেনি। স্বামী যত না রুষ্ট তার চেয়েও শাশুড়ীঠাকরুণ আরো বেশি রুষ্টা। একটি মাত্র ছেলে তাঁর। অনেক দেখে শুনে সুলক্ষণ যুক্তা পরমা সুন্দরী বউ নিয়ে এসেছিলেন গরীবের ঘর থেকে। আদর যত্ন কম করেননি। কিন্তু বন্ধ্যা নারীর স্থান সংসারে নেই। শাশুড়ী ঠিক করেছেন বংশধরের জন্যে আবার তিনি ছেলের বিয়ে দেবেন।

লোকমুখে শুনে বাপ মা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তারাপীঠে ক্ষেপা বাবার কাছে। তিনি যদি দয়া করেন মেয়েটার কপাল পোড়ে না। স্বামীর সংসারে সুখের ভাত ফেলে গরীব বাপের সংসারে দুঃখের অন্ন খেতে হয় না।

শোনে পাগল ছেলে। মুখ গম্ভীর। বলে, বেটি তোর স্বামীটা ভেড়া বটে।

চুপ করে থাকে দুঃখিনী। কি বলবে সে। স্বামী নিন্দা করাতো দূরের কথা, শোনাও মহাপাপ। শুনেছে বিবাহিতা নারীর কাছে স্বামীই প্রথম গুরু। স্বামীর দোষ গুণের বিচার করা অন্যায় অপরাধ এতো নারীর মজ্জায়-মজ্জায়। তবু শুনতে হয়। এসেছে অনেক আশা করে। প্রতিবাদ করলে যদি রুষ্ট হন সাধক। যদি করুণা না করেন?

হাসে পাগল ছেলে। স্বামী নিন্দে শুনতে ভাল লাগছে না, তাই নারে বেটি? কিন্তু কি করবো বলতো মা, না বলেও যে পারি না। দুঃখ হয় রে। এই তো ঘরে-ঘরে।

কাঁদে মেয়েটি। কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবা দয়া করুন আপনি।

আমি কে রে? দয়া করবে মা। মায়ের অপার করুণা যদি না থাকতো সংসার যে শ্মশানে পরিণত হ'ত মা। কাঁদিস নি মা। মন্দিরে যা। মাকে মনের কথা জানাগে ভাল করে। আমি বলছি নিশ্চয়ই তিনি দয়া করবেন। মা যে আমার করুণাময়ী রে। সন্তানের আকুল

কান্নায় তিনি কি চুপ থাকতে পারেন! যা মা যা, কোন ভয় নেই। স্বামীর সংসার থেকে কেউ তোকে হঠাতে পারবে না।

বাপ-মায়ের সঙ্গে মেয়ে মন্দিরে যায়। সন্দেহ ভরা মন নিয়ে ঘরে ফেরে। স্বামীর ঘরে যায়। শুরু হয় নির্যাতনের দিন। বিনিদ্র রাত কাটে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। শাশুড়ি ছেলের পাত্রী দেখে। ঠিক হয় বিবাহের দিন। কিন্তু মায়ের করুণায় সন্তান-সম্ভবা হয় পুত্রবধূ। স্বামীকে স্ত্রী বলে, তোমার সন্তান আমার গর্ভে—যদি ইচ্ছে হয় তুমি আবার বিবাহ ক'রতে পার!

স্বামী মাতৃভক্ত সন্তান। পুত্রবধূর গর্ভসঞ্চারের সংবাদে তিনিই ছেলের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেওয়া থেকে বিরত হন।

ছেলেকে বাবার পায়ের কাছে শুইয়ে দিয়ে ভক্ত বলে, বাবা, আপনার সন্তান, একটু আশীর্বাদ করে দিন।

বাঃ বাঃ সুন্দর ছেলে, খাসা ছেলে। ধার্মিক বুদ্ধিমান হবে বাবা। অনেক পড়াশোনা হবে।

কিন্তু বাবা, দুবেলা ভাল করে খাওয়া জোটাতে পারি না। লেখা-পড়া শেখাবো কি করে বাবা।

ভাবছিস কেন বাবা। সময়ে সব হবে। তারা মাকে ডাক বাবা।

আবার কখনো ছেলের বাপের দিকে চেয়ে জানতে চায় সাধক, এটি কে বাবা?

আমার ছেলে বাবা। উত্তর দেয় ভক্ত।

তোর ছেলে?

হ্যাঁ বাবা, আমার ছেলে।

তা বাবা এটিকে কেন এনেছিস বাবা?

আপনার আশীর্বাদের জন্যে। আপনার আশীর্বাদ পেলে ধন্য হয়ে যাবে আমার ছেলে।

কিন্তু বাবা, কি আশীর্বাদ করি বলতো?

বাবা দয়া করুন।

বাবা, ছেলেটি তোর ভালই। তবে বাবা বড় হলে বদ্ধ মাতাল হবে বাবা।

বাবা ও কি ভাল হতে পারে না বাবা? কেঁদে ফেলে ভক্ত।

কাঁদিসনি বাবা। কেঁদে কি হবে? ললাটের লিখন কি কখনো খণ্ডানো যায় বাবা।

সিদ্ধ সাধক। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। বৈচিত্র্যে ভরা জীবন। জীবনের দীর্ঘদিন কেটেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভয়ঙ্কর শ্মশান-অভ্যন্তরে। মানুষের সামনে যখন এসেছে তখনই দেখেছে মানুষ—সান্নিধ্য লাভ করেছে। কিন্তু যখন তিনি মানুষের চোখের বাইরে থেকেছেন তখন কিছুই জানা সম্ভব হয়নি মানুষের পক্ষে।

অজ্ঞাত সাধকের জীবন। অজানা তাঁর সাধন-পদ্ধতি। গুরুজ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন ব্রজবাসী কৈলাসপতিকে, মোক্ষদানন্দকে। কিন্তু প্রকৃতি গুরু তাঁর কে? কে তাঁকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সত্যের আলোকে পৌঁছে দিয়েছিল—কে?

মানুষের বন্ধু ছিলেন তিনি, ছিলেন মানবদরদী। বলতেন, মায়া ত্যাগ করলে কি মাকে পাওয়া যায়?

ভালবাসতে হবে মানুষকে।

উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়র ভেদ ছিল না তাঁর কাছে। সকলেই তাঁর কাছে সমান। মায়ের কাছে সব সন্তান-ই তো আদরের। ভাল ছেলেটাকে মা শুধু কাছে টানবে, আদর করবে—দুষ্টুগুলো যাবে কোথায় তাহলে?

মা তো শুধু মা নয়—মা যে জগন্মাতা!

জীবন বড় বিচিত্র হে! জীবনের চলার পথে কত বাধা, কত বিপত্তি—ঘাত প্রতিঘাত। জীবন তো মানুষের। সাধকের জীবন

অথবা সংসারীর। সংসারের মানুষ খোঁজে আত্মতৃপ্তি, গণ্ডীবদ্ধ জীব। শ্মশান তো শূন্য। জীবনের শেষ গতি সেখানেই।

তারা মায়ের পাগল ছেলে শ্মশানকে করেছিল সার। কিসের আশায়?

চল মন সুধাতীর্থে—তারাপীঠে।

মন্দিরে মা রয়েছেন। দেখা শেষ। চল দেখে আসি শ্মশানে। বামাক্ষেপা সাধনা করতো শ্মশানে। কতশত গল্পকথা ছড়িয়ে আছে শ্মশান ঘিরে। পা ফেলার জায়গা নেই—চারি দিকে নরমুণ্ডের ছড়াছড়ি। কয় কিছু তো নেই। মিথ্যে-মিথ্যে, কিছুই নেই।

ছিল কিছুদিন আগেও। জীবনের প্রথম পর্বে দেখেছি নির্জনতা। মানুষের এত কোলাহল সেদিন ছিল না।

দেখেছি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। শুনেছি পরে।

গুরু শিষ্যে তারাপীঠ এসেছেন। শিষ্যের মা গুরুকে বললেন একদিন, বাবা রোজ স্বপ্ন দেখি আপনার ছেলের পিছনে ফণা উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কি হবে বাবা?

গুরু তারাপীঠ যাবেন। শিষ্যকে বললেন, চল আমার সঙ্গে।

গুরু শিষ্যে তারাপীঠ এলেন সঙ্গে আরো একজন শিষ্য। অমাবস্যার রাত্রি। শ্মশানে সর্প দংশন করল শিষ্যকে।

শিষ্যের পায়ে দড়ি বাঁধা হল। গুরু শিষ্যকে বসিয়ে দিলেন পঞ্চমুণ্ডির আসনে। বললেন, মাকে ডাক।

শিষ্য মাকে ডাকবে কি, পা ফুলে উঠছে—অসহ্য যন্ত্রণা। বলল, আমার পা ফুলে উঠছে, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে চাও?

আমি দড়ি খুলে ফেলতে চাই। খুলবো?

গুরু বললেন, যদি মনে হয় খুলে ফেলতে, খুলে ফেল বাঁধন।

শিষ্য গুরুর সম্মতি পেয়ে খুলে ফেলল পায়ের বাঁধন। আঃ কি আরাম। পরদিন তারাপীঠ জুড়ে হৈ-চৈ। রাত্রের ঘটনা প্রচার হয়ে গেছে

মুখে মুখে। নানা জনের মুখে নানা কথা। কেউ বলে ছেলেটি মারা গেছে। কেউ বলে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে তাকে, খবর এসেছে বাঁচবে না।

পরদিন গভীর রাতে আবার শ্মশানে যায় গুরুর সঙ্গে শিষ্য দুজন।

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে গুরু জানান, মা তোমাকে রক্ষা করেছেন। মৃত্যুযোগ কেটে গেছে তোমার।

রক্ষা করেছেন জগন্মাতা।

আজও জগন্মাতাই রক্ষা করে চলেছেন। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ সন্তান মায়ের আহ্বানে ছুটে চলেছে সুধাতীর্থে। মা ডাকছেন, ওরে আয়-আয়-আয়।

মায়ের ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য কি সন্তানের পক্ষে।

মায়ের আহ্বানে ঘর ছেড়েছিল পাগল ছেলে। জীবনভর করে গেছে কত বিচিত্র লীলা। মুমূর্ষুকে প্রাণ দিয়েছে, নিঃসন্তানকে সন্তান। মুহুর্মুহু তারা নাদে প্রকম্পিত হয়েছে সুধাতীর্থের আকাশ-বাতাস।

ছুটে এসেছে ভক্তের দল। দিনের পর দিন বেড়েছে স্রোত। রিক্ত নিঃস্ব আর্ত অসহায় মানুষ ছুটে গেছে। ছুটে গেছে ধনী, শিক্ষিত মানুষ। টাকা দিয়েছে মানুষ। সেই টাকায় আতুর দরিদ্রের সেবা হত।

শেষ পর্যন্ত এমন হল টাকা রাখার জন্যে প্রয়োজন হল সিন্দুকের। এল সিন্দুক।

সিন্দুক দেখে পাগল ছেলে ভক্তদের কাছে জানতে চাইল, ওটা কি বাবা?

প্রণামীর টাকা রাখার জন্যে লোহার সিন্দুক এনেছি বাবা।

তা বেশ করেছো বাবা, ভাল করেছো বাবারা। কিন্তু বাবা ওতে টাকা আছে জানবো কি করে বাবা, কৈ আওয়াজ তো হচ্ছে না?

সিন্দুকের ভেতরে রাখা হল পাথর। ভক্ত টাকা ফেলে বলল, ওই শুনুন বাবা আওয়াজ হচ্ছে। শুনুন—টং টং টং।

কি আনন্দ-কি আনন্দ! হাসি আর থামে না পাগল ছেলের। আহা, কি মধুর আওয়াজ বাবা, যেন ত্বং-ত্বং তারা তারা বলছে।

সিন্দুক এল, কিন্তু চুরি বন্ধ হল না। টাকা চুরির জন্যেই সিন্দুক নিয়ে আসা। অথচ চাবি থাকে টাকার মালিকের কাছে। শেষে একদিন চোর ধরা পড়লো। ভক্ত বলেন, অমুককে চাবি দেবেন না বাবা, সে ভারি চোর। অনেক টাকাই সে আপনার চুরি করেছে।

হাসে ছেলে। বলে, ঠিক বলেছো বাবা, ও শালা ভারি চোর, কিছুতেই আমি ওকে চাবি দোব না।

আবার চোরকে বলে, তুই শালা ভারি চোর।

আমি চোর! কে বললে বাবা?

অমুক বলেছে, তুই অনেক টাকা চুরি করেছিস। খবরদার আর চুরি করিস নি, কেমন?

সাবধান করে দেওয়া হল চোরকে।

কিন্তু সিন্দুক থেকে একদিন অন্য একজন চুরি করল প্রায় তিন চার হাজার টাকা। ধরা পড়ল। এক উকিলভক্ত পুলিশে দিল তাকে। বিচারে নিশ্চই জেল হবে। সাক্ষীর অভাব নেই।

ঠিক হবে। যেমন কর্ম-তেমনি ফল। পাগল ছেলের মহা আনন্দ।

হাকিম আদালত বসিয়েছেন বাড়িতে। ভক্তরা পালকি করে নিয়ে এল। আসামীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হাজির করা হল। সে মাথা নীচু করে কাঁদতে লাগল।

ওরে শালা তুই গয়না পরে আবার কাঁদছিস কেন রে?

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, এই আসামী আপনার টাকা চুরি করেছে?

পাগল ছেলে অবাক, কি বললেন বাবা, আমার টাকা?

হ্যাঁ, আপনার টাকা চুরি করেছে আসামী?

টাকা চুরি করেছে? বিস্মিত কণ্ঠে বলে পাগল ছেলে, কার টাকা কে চুরি করে? ওর খুব অভাব, তাই নিয়েছে—বেশ করেছে।

উকিলভক্ত বলেন, ও আপনার অনেক টাকা চুরি করেছে বাবা।

না বাবা আমার টাকা নয়। দেখ বাবা, যত টাকা টাকা করবে ততোই দূরে চলে যাবে। টাকা নিয়েছে—বেশ করেছে। ওকে এখন ছেড়ে দাও।

আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হল। এক পালকিতে ফিরল দুজন।

পালকিতে বসেই কাঁদছে সে।

কাঁদিস কেন বাবা, কাঁদতে নেই। কারো কান্না দেখলে আমার বড় দুঃখু হয় রে—বুকে বাজে। চুরি করলে কি দুঃখ ঘোচে? মাকে ডাক, দিনরাত্তির তারা-তারা কর, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

কু-ঝিক্-ঝিক, গাড়ি চলছে মাঠ-ঘাট পার হয়ে। জানলার ধারে বসে শিশু ভোলানাথ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে দূরের দিকে। মুখে ফুটি-ফুটি হাসি। চঞ্চল হয়ে তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক।

হাসছে শিশু। দেখছে দুচোখ ভরে। কখনো বা গুনগুনিয়ে উঠছে কণ্ঠ। তারা মায়ের আদুরে ছেলে চলেছে কোলকাতা, কালীঘাটের কালীমাকে দেখতে। একান্নপীঠের একপিঠ কালীঘাট। বেলা পড়ে আসছে। একবার কালীমাকে দেখবো না।

হ্যাঁ, বাবা আমার যে একবার কালীঘাটের কালীমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

ভক্তরা সদা প্রস্তুত। বলল, যাবেন বাবা?

আমাকে নিয়ে যাবেন বাবা একবার কালীমার কাছে ?

কবে যাবেন বাবা ?

তারা মাকে বলেছি। মা বললে ঘুরে আয় একবার। যদি আজ নিয়ে যান আপনারা আজই যাব।

নিয়ে যাওয়া বললেই তো নিয়ে যাওয়া যায় না। ভক্তের দল কোলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে। ইদানীং শরীর খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। যাতে গিয়ে কোন কষ্ট না হয় সেদিকটা দেখতে হবে।

সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। জয়তারা বলে যাত্রা শুরু। গাড়ি ছোটে কু-ঝিক্-ঝিক্, শিশু ভোলানাথ আনন্দে আটখানা।

দিগম্বর ভোলানাথ। কোলকাতায় রাজার অতিথি। রাজকর্মচারীদের সুব্যবস্থায় হাওড়া স্টেশনে নির্বিঘ্নে নামল সকলে। প্রস্তুত গাড়ি। কিন্তু দেখতে-দেখতে ভিড় জমে গেল।

হ্যাঁ বাবা, এত লোক কেন বাবা ?

আপনাকে দেখতে এসেছে বাবা।

আমাকে দেখতে ! কেন বাবা, আমায় দেখার কি আছে ?

ভক্তরা নীরব। কি উত্তর দেবে তারা !

শিশু ভোলানাথকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ছুটলো কালীঘাটের পথে। সঙ্গে মহারাজ। শিশু দেখছে মানুষ—পথ।

গাড়ি পৌঁছাল কালীঘাটে।

বাবা, এসে গেছি আমরা।

এসে গেছি ?

হ্যাঁ বাবা, ওই তো মায়ের মন্দির।

বাঃ বাঃ, সুন্দর। সুন্দর মন্দির মায়ের। তা বাবা আদি গঙ্গায় আগে নেয়ে নিই—তবে তো মন্দিরে যাব মায়ের কাছে।

ক্ষীণা আদি গঙ্গা, যেন বয়েসের ভারে বৃদ্ধা। শিশু ভোলানাথ সটান গিয়ে নেমে পড়লেন গঙ্গায়। তারা-তারা, কালী-কালী।

শুরু হল স্নান। তারা মায়ের পাগল ছেলে শুধু ডোবে আর ওঠে। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওদিকে শেষ হয়ে যায় মায়ের পূজা-ভোগ। এইবার বুঝি দরোজা বন্ধ হয়ে যাবে।

বাবা, মায়ের পূজা ভোগ যে শেষ হয়ে গেল। বলে ভক্ত।

এই যাচ্ছি বাবা। তারা-তারা। আবার ডুব।

বাবা, এবার মন্দিরের দরোজা বন্ধ হয়ে যাবে।

এই হল বাবা। শ্রীদুর্গা, কালী, জয় তারা। বলতে বলতে আবার ডুব।

শেষে ওঠে পাগল ছেলে। তারা-তারা বলতে বলতে এগিয়ে যায় মন্দিরের দিকে। অন্য দিন এসময় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, আজ মা সন্তানের জন্যে অপেক্ষা করছে।

মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সন্তান। মা-মাগো, আহা রূপের কি ছটা, লক্‌লকে জিভ, টানা টানা চোখ—তুই কাদের মেয়ে রে? চল না মা, আমার সঙ্গে যাবি? কি রে বেটি যাস যদি তোকে কোলে করে তারা মার কাছে নিয়ে যাই।

নির্বাক স্তব্ধ হয়ে দেখছে মানুষ। শুনছে মা ছেলের কথা।

যাবি তো চল—তোকে কোলে করে নিয়ে যাই। পাগল ছেলে তুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিতে চায়।

বাধা দেয় পূজারীর দল।

দেখতে দেখতে শিশু ভোলানাথ রুদ্রভৈরব। কি নিয়ে যেতে দিবি না তোদের রাক্ষুসে কালীকে। তোদের মা তো মা নয় চামুণ্ডা। মায়ের মত মা আমার তারা মা। লক্ষ্মী মেয়ে। মা আমার জগজ্জননী। যত দেখি আশ মেটে না।

মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পাগল ছেলে। ভাবে বিভোর।

ভক্ত বলে, বাবা নকুলেশ্বরের মন্দিরে যাবেন না?

না বাবা, আর কোথাও যাব না। আমি যাব আমার মায়ের কাছে। তারা-তারা।

তারা নামে হাসি ফোটে মুখে। হাঁটে শিশু—দিগম্বর ভোলানাথ।

কত লীলা, কত খেলা! অগুনতি দিন মাস বছরের হিসাব। আজও কত বিভূতি নিঃসাড়ে বয়ে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন শ্মশানে। যেখানে থাকে বিভিন্ন প্রকৃতির সাধু-অসাধু, সতী-অসতীর শেষ নিঃশ্বাস জাগরুক হয়ে চির শান্তিময়ীর কোলে। মায়ের এই পবিত্র লীলাভূমি সাধুর সাধনপীঠ, অসাধুর নরক, ডাকিনী, প্রেতিনীর বীভৎস তাণ্ডবলীলার নৃত্যমণ্ডপ।

জীবন বড় ছোট হে! আর কেন?

দুরন্ত শিশু খেলা শেষে ক্লান্ত! আশ্রয় চায় মায়ের কোলে। ঘুম-ঘুম। বহু বিনিদ্র রজনীর জাগরণে ক্লান্ত দেহ। আর নয়। নিদ্রার বড় প্রয়োজন।

মুখে হাসি নেই, কথা নেই। শুধু চিন্তা আর চিন্তা। শরীর অসক্ত। মাগো এবার তোর কোল দে মা।

ভক্তের দল ঘিরে থাকে সবসময়।

পাগল ছেলে স্থির—নিশ্চুপ।

বাবা। ডাকে ভক্ত।

বলুন বাবা। মুগ্ধ কণ্ঠে জানতে চায় পাগল ছেলে।

কি হয়েছে বাবা?

কিছু হয়নি তো বাবা। মৃদু হাসি ফুটে ওঠে শিশুর কণ্ঠে।

কিছু নিশ্চই হয়েছে বাবা। বলে ভক্ত। যত দিন যাচ্ছে নীরব হয়ে যাচ্ছেন আপনি।

অনেক গান গেয়েছি বাবা। কত কাজ ছিল করার, কিছুই যেন করা হল না। কিছুই তো শেষ করা যায় না। শেষ তো নেই কিসের শেষ? শুরুই তো হল না।

বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারায় মাঠ-ঘাট ভেসে যাচ্ছে। দ্বারকা হয়ে উঠেছে খরস্রোতা। মহাশ্মশানের প্রান্তে ক্ষুদ্র কুটিরে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে পাগল ছেলে। ভক্তের দল উপস্থিত। ঘিরে আছে প্রিয় কুকুরগুলি।

আর কেন?

মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকাল পাগল ছেলে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হুঁ।

বাবা। ডাকল ভক্ত।

কি হল বাবা?

আপনি কি বললেন বাবা?

ও কিছু নয় বাবা। অর্ধনিমীলিত চক্ষু, আপন ভাবে সমাহিত। তারা-তারা। যাবার সময় হয়েছে—এবার যেতে হবে।

ভক্তকণ্ঠে আর্তনাদ, বাবা!

হ্যাঁ, বাবা। আর কেন?

আপনি চলে গেলে আমরা কি নিয়ে থাকবো বাবা?

জগন্মাতা রইলেন বাবা। রইলে তোমরা। তারা মায়ের হাজার-হাজার সন্তান। তোমাদের মধ্যেই আমি রয়েছি—থাকবো।

কাঁদে ভক্তরা। হাসি মুখে তাদের সান্ত্বনা দেয় পাগল ছেলে। তোমরা কেঁদ না বাবা। সংসারে দুঃখ-বেদনা দুই আছে কিন্তু বাবা আনন্দটাকে হারিয়ে যেতে দিও না।

তেরশো আঠারো সাল।

রাত্রি প্রভাত হয়। ধ্যানমগ্ন যোগী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তারা মায়ের পাগল ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে।

সব শেষ!

শেষ? কোথায় শুরু—শেষ কোথায়? শেষ বলে আছে কি কিছু?

শেষ যদি হয়, মন, কেন তুমি ছোট সুধাতীর্থে—কেন? কোন্ আকর্ষণে?

প্রতিবার বলে ফিরি, আর নয়—এই শেষ। কেন মিথ্যে ছুটে আসি? কেন এই বার-বার আসা? কি আছে এখানে? কি পাই —হারাই বা কি? আর নয়, এই শেষ!

শেষ নয় শুরু। মন বলে চল-চল, ঘুরে আসি—দেখে আসি মাকে। যে মা রয়েছে সদা মনমৈনাকে।

মন ছোটে সুধাতীর্থের পথে!

———